হাজার চুরাশির মা

মহাশ্বেতা দেবী

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2011.02.27 00:05:32 +06'00'

সকাল

স্বপ্নে সুজাতা বাইশ বছর আগেকার এক সকালে ফিরে গিয়েছিলেন, প্রায়ই যান। নিজেই ব্যাগে গুছিয়ে রাখেন তোয়ালে, জামা, শাড়ি, টুথব্রাশ, সাবান। সুজাতার বয়স এখন তিপান্ন। স্বপ্নে তিনি দেখেন একত্রিশ বছরের সুজাতাকে, ব্যাগ গোছানোয় ব্যস্ত। গর্ভের ভারে মন্থর শরীর, তখনো যুবতী এক সুজাতা ব্রতীকে পৃথিবীতে আনবেন বলে একটি একটি করে জিনিস ব্যাগে তোলেন। সেই সুজাতার মুখ বার বার যন্ত্রণায় কুঁচকে যায়, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে কান্না সামলে নেন সুজাতা, স্বপ্নের সুজাতা, ব্রতী আসছে।

সেদিন রাত আটটা থেকেই যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল, হেম অভিজ্ঞের মত বলেছিল, পেট নাবুতে নেমেছে মা। আর দেরি নেই। হেমই ওঁর হাত ধরে বলেছিল, ভাল ভালতে দুজনেই দু' ঠাঁই হয়ে ফিরে এস।

যন্ত্রণা হচ্ছিল, ভয়ানক যন্ত্রণা। যে কোন সময়ে সন্তান হতে পারে বলে সুজাতা আগের দিন থেকেই নার্সিংহোমে। জ্যোতির বয়স তখন দশ, নীপার আট, তুলির ছয়। শাশুড়ি সুজাতার কাছেই ছিলেন, মনে আছে। জ্যোতির বাবা শাশুড়ির একমাত্র সন্তান। একটি সন্তান হতেই শাশুড়ি বিধবা। সুজাতার সন্তান হওয়া দেখতে পারতেন না তিনি, ভয়ংকর বিদ্বেষের চোখে তাকাতেন। ঠিক সন্তান হবার সম-সমকালে চলে যেতেন বোনের বাড়ী, সুজাতাকে অকূলে ভাসিয়ে।

স্বামী বলতেন মা অত্যন্ত নরম, বুঝলে? তিনি এসব দেখতে পারেন না, যন্ত্রণা-টন্ত্রণা—চেঁচামেচি।

অথচ সুজাতা চেঁচাতেন না, কাতরাতেন না কখনো। দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরে ছেলেমেয়েদের বিলিব্যবস্থা করতেন। সেবার

শাশুড়ি এখানে ছিলেন, কেননা বোন কলকাতায় ছিলেন না। জ্যোতিদের বাবা কানপুর গিয়েছিলেন কাজে, মনে আছে। দিব্যনাথ জানতেনও না মা থেকে যাবেন এবার। থাকেন না, এবার থাকবেন না এই জানতেন। তবু সুজাতার জন্য ব্যবস্থা করে যান নি দিব্যনাথ। কোনদিনই করেন নি। সুজাতা বাথরুমে গিয়ে যন্ত্রণায় কেঁপে ওঠেন। ভয় পেয়ে যান রক্ত দেখে। নিজেই সব গুছিয়ে নেন, ঠাকুরকে বলেন ট্যাক্সি আনতে।

নার্সিংহোম চলে যান একা একা। ডাক্তার খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। ভয় পেয়েছিলেন খুব। সুজাতার চোখ যন্ত্রণায় ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল, যেন চোখের ওপর কাচ ঢেকে দিচ্ছিল কে, অস্বচ্ছ কাচ। জোর করে চোখ খুলে ডাক্তারের দিকে চেয়ে সুজাতা বলেছিলেন, অ্যাম আই অলরাইট?

নিশ্চয়।

চাইল্ড?

আপনি ঘুমোন।

কি করবেন?

অপারেশন।

ডাক্তরবাবু, চাইল্ড?

আপনি ঘুমোন। আমি ত আছি। একা এলেন কেন?

উনি নেই।

সুজাতা অবাক হয়েছিলেন। তিনি ত' আশাই করেন নি, কলকাতায় থাকলেও দিব্যনাথ সঙ্গে আসবেন, ডাক্তার কেন আশা করেন। দিব্যনাথ সঙ্গে আসেন না, সুজাতাকে নিয়ে যান না সময় হলে। নবজাতকের কান্না শুনতে হবে বলে তেতলায় ঘুমোন। সন্তানদের অসুখ হলেও রাতে খোঁজ নেন না। তবে দিব্যনাথ লক্ষ্য করেন, সুজাতাকে লক্ষ্য করে দেখেন, আবার মা হবার যোগ্য শরীর হচ্ছে কিনা সুজাতার।

টনিক খাচ্ছ ত ?

গাঢ়, যেন কফবসা গলায় জিগ্যেস করেন দিব্যনাথ। কামনায় অস্থির হলে ওঁর গলায় যেন কফ জমে থকথকে হয়ে যায় স্বর। সুজাতা জানেন দিব্যনাথকে। দিব্যনাথ তাঁর শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নেবার একটি অর্থই হতে পারে। ডাক্তার কি করে জানবেন দিব্যনাথকে ?

সুজাতাকে ওষুধে দেন। ওষুধে ব্যথা কমে নি। সেই সময়ে সহসা সুজাতার মনে ভীষণ ব্যাকুলতা এসেছিল সন্তানের জন্যে। তুলি হবার পর ছ' বছর কেটে যায় প্রায়। অনেক কষ্টে সুজাতা নিজেকে রক্ষা করেছিলেন, শেষ রাখতে পারেন নি।

তাই অশ্লীল, অশুচি লেগেছিল নিজেকে ন'মাস ধরে। শরীরের ক্রমবর্ধমান ভারকে মনে হয়েছিল অভিশাপ। কিন্তু যখন বুঝলেন তাঁর আর সন্তানের জীবনসংশয় হতে পারে, তখনি বুক ভরে উঠেছিল ব্যাকুল মমতায়। সুজাতা ডাক্তারকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, অপারেশন করুন ওকে বাঁচান।

তাই ত করছি।

ডাক্তারের কথায় নার্স ইঞ্জেকশন দেয়। যন্ত্রণা সুজাতার তলপেটে ফুঁড়ে ফুঁড়ে ঢুকছিল আর বেরোচ্ছিল। উনিশশো আটচল্লিশ সাল। যোলই জানুআরি। সুজাতা বিছানার সাদা চাদর খামচে ধরছিলেন বার বার। কপাল ঘেমে উঠছিল। চোখের নিচে কালো দাগটা ছড়িয়ে পড়ছিল, বড় হচ্ছিল। একটুও শীত করছিল না সুজাতার। অথচ সে জানুআরিতে তীব্র শীত।

তলপেটে যন্ত্রণা ফুঁড়ে ফুঁড়ে ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। বিছানার সাদা চাদর খামচে ঘামতে ঘামতে সুজাতা জেগে উঠলেন। পাশে জ্যোতির বাবাকে দেখে তাঁর সাদা কপালে লম্বা ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। জ্যোতির বাবা পাশের খাটে কেন ? তারপর মাথা নাড়লেন!

কৃতী হবার দিন জ্যোতির বাবা কাছে ছিলেন না, তাই সুজাতার স্বপ্নেও দিবানাথ কখনো থাকেন না, কিন্তু এখন ত আর স্বপ্ন দেখছেন না সুজাতা।

তারপর কোনমতে হাত বাড়ালেন। ব্যারালগান ট্যাবলেট। জল। ট্যাবলেট খেলেন, জল খেলেন। আঁচল দিয়ে কপাল মুছলেন।

আবার শুলেন। এখন খুব দরকার এক থেকে একশো গুণে ফেলা। ডাক্তারের নির্দেশ। গুণলেই ব্যথা কমে যায়। গুণতে যা সময় লাগে, তার মধ্যেই ব্যারালগান কাজ করতে শুরু করে। ব্যথা কমে।

তারপর ব্যথা কমে। সুজাতাকে ক্লান্ত, অবসন্ন, পরাজিত করে ব্যথা কমে। ব্যথা এখনই কমেছে। এখন ব্যথা কমা দরকার। ঘড়ির দিকে চাইলেন। ছ'টা বেজেছে। দেওয়ালের দিকে চাইলেন। ক্যালেণ্ডার। সতেরই জানুআরি। ষোলই জানুআরী সারারাত যন্ত্রণা ছিল, জ্ঞানে-অজ্ঞানে, ইথারের গন্ধ, চড়া আলো, আচ্ছন্ন যন্ত্রণার ঘোলাটে পর্দার ওপারে ডাক্তারদের নড়াচড়া সারারাত, সারারাত, তারপর ভোরবেলা, সতেরই জানুআরি ভোরে ব্রতী এসে পৌঁছেছিল। আজ সেই সতেরই জানুআরি, সেই ভোর, দু' বছর আগে সতেরই জানুআরি এই ঘরে, এমনি করে এই লোকটির পাশের খাটেই ঘুমোচ্ছিলেন সুজাতা। টেলিফোন বেজেছিল। পাশের টেবিলে। হঠাৎ।

টেলিফোন বাজছে। জ্যোতির ঘরে। দু'বছর আগে সেদিনের পরেই জ্যোতি টেলিফোনটা ওর নিজের ঘরে নিয়ে যায়, বিবেচক, বিবেচক জ্যোতি। তাঁর প্রথম সন্তান, তাঁর জ্যেষ্ঠ। দিব্যনাথের অনুগত ও বাধ্য ছেলে। বিনির সহৃদয় স্বামী, সুমনের স্নেহময় পিতা।

বিবেচক জ্যোতি। সুজাতা দু'বছর আগে একান্ন পার করেছিলেন, জ্যোতির বাবা ছাপান্ন। নিরাপদ বয়স, জীবন দু'জনের গুছানো সুশৃঙ্খল। মেয়ের বিয়ে হয়েছে, ছোট মেয়ে মন ও পাত্র

স্থির করেছে, বড়ছেলে সুপ্রতিষ্ঠিত, ছোট ছেলেকে বাবা কলেজের পরই বিলাতে পাঠাবেন। সব গুছানো, সুশৃঙ্খল, সুন্দর ছিল, বড় সুন্দর।

সেই সময়ে সেই বয়সে টেলিফোন বেজেছিল। মা ঘুমচোখে রিসিভার তুলেছিলেন। হঠাৎ একটা অচেনা নৈর্ব্যক্তিক অফিসার কণ্ঠ জিগ্যেস করেছিল, ব্রতী চ্যাটার্জি আপনার কে হয়?

ছেলে? কাঁটাপুকুরে আসুন।

হ্যাঁ, সেই মুখ-অবয়ব-রক্তমাংসহীন কণ্ঠ বলেছিল, কাঁটাপুকুরে আসুন। রিসিভার আছড়ে পড়েছিল। মা পড়ে গিয়েছিল দাঁতে দাঁত লেগে।

দু'বছর আগে সতেরই জানুআরির ভোরে ব্রতীর জন্মদিনে, ব্রতীর পৃথিবীতে পৌঁছবার সম-সমকালে এই সুন্দর ঝকঝকে বাড়িতে, এই শান্ত সুন্দর পরিবারে, এই টেলিফোনের খবরের মত একটা বিশৃঙ্খল, হিসেব ছাড়া ঘটনা ঘটেছিল।

সেই জন্যেই জ্যোতি টেলিফোনটা সরিয়ে নিয়ে যায়। সুজাতা তা জানতেন না। তিনমাস সুজাতা কিছুই জানতেন না। বিছানায় পড়ে থাকতেন চোখে হাতচাপা দিয়ে। কখনো কাঁদতেন না চেঁচিয়ে। হেম, একা হেম ওঁর কাছে থাকত, ঘুমের ওষুধ দিত, ওঁর হাত ধরে বসে থাকত।

তাই সুজাতা জানতেন না কবে টেলিফোনটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

তিনমাস বাদে সুজাতা আবার ব্যাঙ্কে যেতে শুরু করলেন। আবার জ্যোতি নীপা আর তুলির সঙ্গে সহজভাবে কথা বললেন। জ্যোতির ছেলে সুমনের পেন্সিল কেটে দিলেন। জ্যোতির স্ত্রী বিনিকে বললেন, আমার কালোপাড় শাড়ীটা কি কাচতে দিয়েছ?

জ্যোতির বাবা যখন বম্বে গেলেন, তখন তাঁর সুটকেসে ইসব-গুলের ভুসি দিয়ে দিলেন—

এমনি করেই কখন স্বাভাবিক হয়ে গেল সব, সহজ হয়ে গেল, তখন সুজাতা লক্ষ্য করলেন টেলিফোনটা তাঁর ঘর থেকে জ্যোতির ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

দেখেই ওঁর ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। জ্যোতির বুদ্ধি এত কম! মাথা নেড়েছিলেন বার বার জ্যোতির নির্বোধিতা দেখে। এখন ত আর কোন টেলিফোন আসবে না। জ্যোতির বাবার নিজস্ব চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির আপিস। জ্যোতি ব্রিটিশ নাগরিক। ফার্মের মেজসাহেব। নীপা, বড় মেয়ের বর কাস্টমসে বড় অফিসার। তুলি যাকে বিয়ে করেছে, সেই টোনি কাপাডিয়া নিজে এজেন্সি খুলে সুইডেনে ভারতীয় সিল্ক-বাটিক, কার্পেট, পেতলের নটরাজ ও বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া পাঠায়। জ্যোতির শ্বশুর-শাশুড়ি বিলাতেই থাকেন।

এরা কেউ এমন কোন বেহিসেবী, বিপজ্জনক কাজ করবে না যেজন্যে হঠাৎ টেলিফোন আসতে পারে, হঠাৎ কাঁটাপুকুর মর্গে ছুটে যেতে হবে সুজাতাকে।

এরা কেউ এমন বিরোধিতা করবে না, যেজন্যে জ্যোতি আর তার বাবাকে ছুটোছুটি করতে হয় ওপর মহলে, কাঁটাপুকুরে যেতে হয় শুধু সুজাতা আর তুলিকে।

এরা কেউ এমন অপরাধ করবে না যেজন্যে কাঁটাপুকুরে পড়ে থাকতে হয় চিত হয়ে। একটা ভারি চাদর সরিয়ে ধরে ডোম। ও. সি. জিজ্ঞেস করে, "ডু ইউ আইডেনটিফাই ইওর সান?"

এরা সবাই বিবেচক, নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে, সৎ নাগরিক। এরা সুজাতাকে তেমন কোন অবস্থায় ফেলবে না, জ্যোতির বাবাকে বাধ্য করবে না ছুটোছুটি করতে। সত্যি বলতে কি, তাঁর ছেলে এমন কলঙ্কিতভাবে মরেছে, এই খবরটা ঢাকবার জন্যে জ্যোতির বাবা দড়ি টানাটানি করে বেড়াচ্ছিলেন।

টেলিফোনে খবরটা জানবার পরই জ্যোতির বাবার প্রথমেই

মনে হয়েছিল কেমন করে খবরটা চেপে যাবেন। মনে হয় নি কাঁটাপুকুরে তাঁর যাওয়াটা বেশি জরুরী। জ্যোতি তাঁরই ভাবাদর্শে গড়া, সেও বাবার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সুজাতাকে বাড়ির গাড়ি অব্দি নিতে দেননি দিব্যনাথ। কাঁটাপুকুরে তাঁর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে, সে কি হয়? যদি কেউ দেখে ফেলে?

সেদিন ব্রতীর সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার চেতনায় ব্রতীর বাবারও মৃত্যু ঘটে। ব্রতীর বাবার সেদিনের, সেই মুহূর্তের ব্যবহার সুজাতার চেতনায় প্রবল উল্কাপাত ঘটায়। বিরাট বিস্ফোরণ। আদিম পৃথিবীতে যেমন ঘটেছিল কোটি কোটি বছর আগে। যেমন বিস্ফোরণে মহাদেশগুলো ছিটকে ম্যাপের দুপাশে সরে গিয়েছিল। মাঝখানের দুস্তর ব্যবধান ঢেকে ফেলেছিল মহাসমুদ্র।

দিব্যনাথের সেদিনের ব্যবহারের ফলে, দিব্যনাথ জানেন না, সুজাতার চেতনায় তিনি মরে গেছেন, অবশেষে সরে গেলেন বহুদূরে। সুজাতার পাশেই শুয়ে থাকেন দিব্যনাথ, কিন্তু জানতে পারেন না, মৃত ব্রতীর চেয়ে জীবিত দিব্যনাথের মানসম্মানের কথা, নিরাপত্তার কথা বেশি ভেবেছিলেন সেদিন, তাই সুজাতার কাছে তিনি অনস্তিত্ব হয়ে গেছেন।

দিব্যনাথের ছোটাছুটি দড়ি টানাটানি সফল হয়েছিল। পরদিন খবরের কাগজে চারটি ছেলের হত্যার খবর বেরোয়। নাম বেরোয়। ব্রতীর নাম কোন কাগজে ছিল না।

এইভাবে ব্রতীকে মুছে দিয়েছিলেন দিব্যনাথ। কিন্তু সুজাতা তা পারেন না।

সেরকম নিয়ম-ছাড়া, রুটিন-ছাড়া ঘটনা এ বাড়িতে আর ঘটবে না। তবু জ্যোতি টেলিফোন সরিয়ে নিয়ে গেছে দেখে সুজাতা কৌতুকবোধ করেছিলেন।

বিনি ওঁর ঠোঁটে কৌতুকের হাসি দেখে মনে এত আঘাত পায় যে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। জ্যোতিকে বলে, শী হ্যাজ নো হার্ট।

কথাটা সুজাতাকে শুনিয়ে বলা। সুজাতা শুনেছিলেন, ক্ষুণ্ণ হন নি। এঁর আগে মনে হয়েছে, আবার মনে হয়েছে, আবার মনে হয়েছিল। বিনি ব্রতীকে ভালবাসত।

তখন মনে হয়েছিল বিনি ব্রতীকে ভালবাসে। পরে সে কথা মনে হয় নি। কেননা বারান্দায় ব্রতীর ছবিটা খুঁজে পান নি সুজাতা, ব্রতীর জুতোগুলো দেখতে পান নি। ব্রতীর বর্ষাতিও ছিল না।

বিনি, ছবিটা কোথায় গেল ?

তেতলার ঘরে।

তেতলার ঘরে ?

বাবা বললেন···

বাবা বললেন !

ব্রতী চলে যাবার পরও ব্রতীকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার প্রয়াস দিব্যনাথ ছাড়েন নি দেখে সুজাতা অবাক হন নি, দুঃখও পান নি নতুন করে। শুধু অবসন্ন মনে ভেবেছিলেন, দিব্যনাথই বলতে পারেন এমন কথা। কিন্তু বিনি কি, না ! বলে বাধা দিতে পারত না ?

কোন কথা না বলে সুজাতা ব্যাঙ্কে চলে যান। ব্যাঙ্কে চাকরি তাঁর বহুদিনের। ব্রতীর তিনবছর বয়সে তিনি কাজে ঢোকেন। ব্রতীর বাবার আপিসে তখন একটু টালমাটাল যাচ্ছিল। দুটো বড় বড় অ্যাকাউণ্ট বেরিয়ে গিয়েছিল হাত থেকে।

সেই সময়ে কাজে ঢোকেন সুজাতা। পরিবারের সবাই তাঁকে খুব উৎসাহ দিয়েছিল। এমন কি শাশুড়িও বলেছিলেন, করাই ত উচিত। তুমি বলেই এতদিন বাড়িতে বসেছিলে। দিবুও ত তেমন নয়। তেমন হলে তোমাকে আগেই কাজ করতে পাঠাত।

সুজাতা কেন চাকরি করতে চাইছেন, কেন নিজে খোঁজ করে যোগাযোগ করছেন, সে-কথা কেউ জানতে চাইবার যোগ্য, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন নি। সেটা ভালই হয়েছিল। এ বাড়িতে দিব্যনাথ আর তাঁর মা সকলের মনোযোগ সবসময়ে আকর্ষণ করে

রাখতেন। সুজাতার অস্তিত্বটা হয়ে গিয়েছিল ছায়ার মত। অনুগত, অনুগামী, নীরব, অস্তিত্বহীন।

চেনাশোনা লোক ছিলেন ব্যাঙ্কে। নইলে কাজটা হত না। সুজাতা চাকরি পেয়েছিলেন পরিবার, বংশপরিচয়, অভিজাত চেহারা, বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণের জোরে। নইলে তাঁর মত লোরেটোর বি.এ. পাস মহিলা ত কতই আছেন, তা কি সুজাতা জানতেন না?

শুধু ব্রতী কাঁদত।

স্বপ্নে, তাঁর স্বপ্নে, তিন বছরের ব্রতী তাঁর হাঁটু জড়িয়ে ধরে কতবার কেঁদে বলে, মা তুমি আজ, শুধু আজ আপিসে যেও না, আমার কাছে থাক।

ফর্সা, রোগা ব্রতী, রেশম রেশম চুল, চোখে মমতা।

সেই ব্রতী। মুক্তির দশকে একহাজার তিরাশিজনের মৃত্যুর পরে চুরাশি নম্বরে ওর নাম। কেউ যদি মুক্তির দশকের আড়াই বছরে নিহত ছেলেদের নাম সংগ্রহ করে থাকে, তবে সে কি ব্রতীর নাম খুঁজে পাবে? কাগজ দেখে যদি খোঁজ করে থাকে, সে ত জানবে না ব্রতীকে।

ব্রতীর বাবা ওর নাম কাগজে উঠতে দেন নি।

ব্রতী চ্যাটার্জি?

আপনি কে হন?

না, মুখ দেখতে হবে না।

আইডেণ্টিফিকেশন মার্ক?

গলায় জড়ুল?

মুখ দেখতে হবে না?

কি বলেছিলেন তিনি? আমি দেখব? নীল শার্ট দেখে, আঙুল দেখে, চুল দেখে, কোথায় তবু সংশয় ছিল মনে। কোথায় যুক্তি বুদ্ধি চোখের দেখা সব পরাস্ত করে সংশয় বলছিল, না মুখ দেখলে জানা যাবে এ ব্রতী নয়? তাই কি সুজাতা বলেছিলেন···

ডোমটি ওঁর ওপর অসীম করুণায় বলেছিল, কি আর দেখবেন মাইজী? মুখ কি আর আছে কিছু?

তখন কি করেছিলেন সুজাতা? অন্য চারটি শব পড়ে আছে। কারা যেন আকুল হয়ে কাঁদছে। কে যেন মাথা ঠুকছে মাটিতে। কারো মুখ মনে পড়ে না। সব ধোঁয়া ধোঁয়া। কিন্তু কোন কোন স্মৃতি হীরের ছুরির মত উজ্জ্বল, কঠিন, স্বয়ংপ্রভ।

ওর বুকে, পেটে আর গলায় তিনটে গুলির দাগ ছিল। নীল গর্ত। শরীরে খুব কাছ থেকে ছোঁড়া গুলি। নীলচে চামড়া। কর্ডাইটের ঝলসানিতে পোড়া বাদামী রক্ত। গর্তের চারদিকে কর্ডাইটের ঝলসানিতে ঝলসানো হেলো, চক্রাকার ফাটাফাটা চামড়া। গলায়, পেটে আর বুকে তিনটে গুলির দাগ।

ব্রতীর মুখ, ব্রতীর মুখ, সুজাতা সবলে দুহাতে চাদর সরিয়ে দেন, ব্রতীর মুখ। শাণিত ও ভারি অস্ত্রের উলটো পিট দিয়ে ঘা মেরে থেঁতলানো, পিষ্ট, ব্রতীর মুখ। পেছন থেকে তুলির অস্ফুট আর্তনাদ।

সেই মুখই দেখেন সুজাতা ঝুঁকে পড়ে। আঙুল বোলালেন। ব্রতী! ব্রতী! বলে আঙুল বোলালেন, আঙুল বোলাবার মত মসৃণ চামড়া ছিল না এক ইঞ্চিও। সবই দলিত, থেঁতলানো মাংস। তারপর সুজাতাই মুখ ঢেকে দেন। পেছন ফেরেন। অন্ধের মত তুলিকে ছাপটে ধরেন।

ব্রতীর বাবা ছবিটা সরিয়ে দিতে বলেছেন, একথা ব্যাঙ্কে যাবার সময়ও মনে ছিল। প্রথম দিন ব্যাঙ্কে যাবার সময়ে।

ব্যাঙ্কে সবাই ওঁর দিকে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ সকলের কথা আস্তে হয়ে গিয়েছিল, তারপর চুপচাপ।

এজেন্ট লুথরা এগিয়ে এসেছিল।

ম্যাডাম, সো সরি···

থ্যাংক য়ু। সুজাতা মুখ তোলেন নি।

মেমসাব।

একটা জলের গেলাস। ভিখন এগিয়ে ধরেছিল। সুজাতার পুরনো অভ্যেস, আপিসে এসে জল খান এক গেলাস।

মেমসাব!

ভিখন আস্তে বলেছিল। সুজাতা ওর চোখে বেদনা দেখেছিলেন, মমতা। ভিখন চোখ দিয়ে ওঁকে জড়িয়ে ধরেছে। উনি ওকে জড়িয়ে ধরেছিলেন একদিন। যেদিন ব্যাঙ্কে তার এসেছিল ভিখনের ছেলে অসুখে মরে গেছে।

ভিখনের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিলেন সুজাতা। এখনি উনি ওর সহানুভূতি নিতে পারছেন না। ভিখন, আমায় ক্ষমা কর। ব্রতীর মৃত্যু তোর ছেলের মৃত্যুর মত নয় যে? তোর ছেলের মৃত্যু এমন মৃত্যু, তাতে তোকে দেখলেই তুই যে বেয়ারা তা ভুলে গিয়ে তোকে জড়িয়ে ধরা যায়।

ব্রতী তো তেমন করে মরে নি। ব্রতীর মৃত্যুর আগে অনেক প্রশ্ন পরে অনেক প্রশ্ন। প্রশ্নচিহ্ন। সরাসরি প্রশ্নচিহ্নের মিছিল। তারপর সব প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকতেই, একটি প্রশ্নেরও উত্তর না মিলতেই হঠাৎ ব্রতী চ্যাটার্জির ফাইল বন্ধ করে দেওয়া।

তুই আমাকে মাপ কর ভিখন।

সারাদিন যন্ত্রচালিতের মত কাজ করছিলেন। সন্ধ্যায় ব্রতীর বাবা বাড়ী ফিরতেই জিগ্যেস করেছিলেন,

তুমি ব্রতীর ছবি তেতলায় সরিয়ে দিতে বলেছ?

হ্যাঁ।

ব্রতীর জুতো?

হ্যাঁ।

কেন?

কেন!

দিব্যনাথ নেড়েছিলেন। কেন ব্রতীর জিনিসপত্র সরিয়ে

দেওয়া দরকার, কেন ব্রতীর অস্তিত্ব, স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলা দরকার তা যদি সুজাতা না বোঝেন, কে তাঁকে বোঝাবে ?

দিব্যনাথ কথা বলেন নি।

তেতলার ঘর কি চাবি বন্ধ ?

হ্যাঁ।

চাবি কার কাছে ?

আমার কাছে।

দাও।

চাবিটা হাতে নিয়ে উঠে গিয়েছিলেন সুজাতা। তেতলার ঘরে ব্রতী ঘুমতো। আট বছর থেকে ওই ব্যবস্থা। প্রথমটা একা শুতে চাইত না। একলা শুতে ওর ভয় করত। সুজাতা বলেছিলেন, ঠিক আছে, হেম মেঝেতে শোবে।

দিব্যনাথ রেগে যান। জ্যোতির বেলা সুজাতার এই দুর্বলতা ছিল না, নীপা আর তুলির বেলাতেও নয়, এইসব কথা বলেন। সুজাতা বলেছিলেন, ওদের বেলাতে ওঁর আপত্তি ছিল। কেন না ওরাও ভয় পেত, কিন্তু তখন দিব্যনাথ যা বলেছেন তার অন্যথা হতে পারে এ সুজাতা জানতেন না।

ভয় পেত ব্রতী, খুব ভয় পেত। অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ শিশু যেমন ভয় পায়। রাতে হরিধ্বনি শুনে ভয় পেত, দিনে বহুরূপী ডাকাত সেজে এসে চেঁচালে ভয় পেত। তারপর একদিন ওর সব ভয় চলে যায়।

এখন তো ব্রতী সব ভয় আর অভয়ের বাইরে।

ছোটবেলা থেকে মৃত্যুর কবিতা বড় প্রিয় ব্রতীর। তাইত সুজাতার স্বপ্নে সাতবছরের ব্রতী পা ঝুলিয়ে জানলায় বসে বসে কবিতা পড়ে কত। স্বপ্নে সুজাতা যখন ব্রতীকে দেখেন, তখন তাঁর মনে দু'রকম চেতনা কাজ করতে থাকে। একটা মন বলে এ'ত স্বপ্ন। ব্রতী নেই। এ শুধু স্বপ্ন।

আরেকটা মন বলে স্বপ্ন নয় সত্যি।

সুজাতার স্বপ্নে তাই ব্রতী জানলায় বসে পা ঝুলিয়ে কবিতা পড়ে। সুজাতা বিছানায় বসে শোনেন, ব্রতীর বিছানায়। শোনেন আর ব্রতীর চাদর টেনে দেন। বালিশ ঠিক করে দেন।

কখনো ব্রতী ঘুমিয়ে পড়ে,

"ভয়কাতুরে ছিল সে সবচেয়ে।
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি।"

কখনো বা স্বপ্নে দেখেন ব্রতী 'শিশু' বইটা নিয়ে ঘুরে ঘুরে পড়ছে।

'আধার রাতে চলে গেলি তুই।
আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়
কেউতো তোরে দেখতে পাবে না
তারা শুধু তারার পানে চায়।'

ঘুমের মধ্যে 'ব্রতী!' বলে ডুকরে ডেকে ওঠেন সুজাতা। তারপর ঘুম ভেঙে যায়। এত সত্যি যে স্বপ্নে, এত সত্যি যে, চমকে চমকে চেয়ে সুজাতা দেখেন ব্রতী কোথায়!

তেতলার ঘরের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন সুজাতা। ব্রতীর বিছানা গোটানো। জামা আলমারিতে তোলা। দেওয়ালে ছবি। শেলফে বই। শুধু সুটকেসটা নেই। ওটা পুলিশ নিয়ে গিয়েছিল।

ব্রতীর খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে সুজাতা ভুরু কুঁচকে ভাবতে চেষ্টা করছিলেন, ব্রতীর হত্যার পেছনে তাঁর কি পরোক্ষ অবদান ছিল? কিভাবে তিনি তৈরি করেছিলেন ব্রতীকে যেজন্যে এই দশকে, যে দশক মুক্তির দশকে পরিণত হতে চলেছে সেই দশকে, ব্রতী হাজার চুরাশি হয়ে গেল! অথবা কি করতেন তিনি, অথচ করেন নি বলে ব্রতী হাজার চুরাশি হয়ে গেল? কোথায় সুজাতা ব্যর্থ হয়েছিলেন?

দিব্যনাথ ব্রতীকে সহ্য করতে পারতেন না। বলতেন,

মাদার্স চাইলড! তুমি ওকেই শিকিয়েছ আমার শত্রু হতে।

সুজাতা অবাক হয়ে যেতেন। কেন তিনি ব্রতীকে বলতে যাবেন তোর বাবার শত্রু হ'? কেন বলবেন? দিব্যনাথ কি সুজাতার শত্রু? দিব্যনাথ যাতে যাতে বিশ্বাস করেন, সেই সম্ভ্রান্ততায়, সচ্ছলতায়, নিরাপত্তায় ত সুজাতাও বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করেন কিনা সুজাতা কখনো সে প্রশ্ন নিজেকে করেন নি। করেন নি যখন, তখন নিশ্চয় তাঁর কোন প্রশ্নই ছিল না।

সুজাতা বড়ঘরের মেয়ে। অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবার তাঁদের। লোরেটোয় পড়ানো বি, এ, পাস করানো সবই বিয়ের জন্যে। ছেলের অবস্থা খারাপ, জেনেশুনেই তাঁকে বড়ঘরের ছেলে দিব্যনাথের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। সুজাতার বাবা জানতেন দিব্যনাথ অনেক ওপরে যাবেন।

এই বাড়ি, সচ্ছলতা, নিরাপত্তা, এতে সুজাতাও বিশ্বাস করেন। অতএব দিব্যনাথের অভিযোগ মিথ্যে।

যদি দিব্যনাথের অভিযোগ মিথ্যে হয়, তাহলে শুধু এই প্রমাণ হয় যে, সুজাতা ব্রতীকে দিব্যনাথের শত্রু হতে বলেন নি। এ প্রমাণ হয় না যে ব্রতী ওর বাবাকে শত্রু ভাবে। ব্রতী যে দিব্যনাথকে সহ্য করতে পারে না সে ত সুজাতাও জানেন। ভাল করেই জানেন।

কেন, ব্রতী?

দিব্যনাথ চ্যাটার্জি একক ব্যক্তি হিসেবে আমার শত্রু নন।

তবে?

উনি যে সব বস্তু ও মূল্যে বিশ্বাস করেন, সেগুলোতেও অন্য বহুজনও বিশ্বাস করে। এই মূল্যবোধ যারা লালন করছে, সেই শ্রেণীটাই আমার শত্রু। উনি সেই শ্রেণীরই একজন।

কি বলিস তুই ব্রতী? বুঝি না।

বুঝতে চেষ্টা করছ কেন? বোতামটা লাগাও না।

ব্রতী, তুই খুব অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিস।

কি রকম?

বদলে যাচ্ছিস।

বদলাব না?

কোথায় ঘুরিস সারাদিন?

আড্ডা দিই।

কাদের সঙ্গে?

বন্ধুদের।

নে তোর জামা। বোতাম লাগাতে বললি তাই মার সঙ্গে দুটো কথা বলার সময় হল।

ব্রতী কথা বলে নি। চোখ কুঁচকে হেসেছিল। ওর হাসিতে কথা বলার ভঙ্গিতে কি যেন এসে যাচ্ছিল ক্রমাগত। সহিষ্ণুতা, ধৈর্য। যেন সুজাতা কথা বলার আগেভাগেই ও জানে ওর কথা সুজাতা বুঝবেন না। ওঁর সঙ্গে কথা বলত যেন ওর বাবা, সুজাতা ওর ছোট মেয়ে। ওঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ছেলে ভোলাচ্ছে ব্রতী। সুজাতা বুঝতে পারছিলেন ব্রতী ওঁর অজানা হয়ে যাচ্ছে ক্রমে, অচেনা। তখন মনে দুঃখ হয়েছে খুব। কেন মনে আশংকা হয় নি? ভয় হয় নি?

কেন মনে হয় নি মার কাছে ছেলে ক্রমেই অচেনা হয়ে যায়, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এক বাড়িতে বাস করেও, এ থেকে ভীষণ বিপদ হতে পারে একদিন?

ব্রতীর ঘরে দাঁড়িয়ে সুজাতা ভুরু কুঁচকে ভেবেছিলেন, আর ভেবেছিলেন।

ব্রতী যদি সুজাতার দাদার মত দুরারোগ্য অসুখে মারা যেত, তাহলেও মৃত্যুর পর প্রশ্ন থাকতে পারত মনে। সে প্রশ্নগুলো এইরকম হত—ডাক্তারের কোন ত্রুটি হল, না বাড়ির লোকের? এ ডাক্তারকে না ডেকে ও ডাক্তারকে ডাকলে কি হত? ও ওষুধ না দিয়ে অন্য ওষুধ দিলে কি হত? ব্যাধিজনিত মৃত্যুর পরবর্তী প্রশ্নগুলো এই রকমই হয়ে থাকে।

ব্রতী যদি দুর্ঘটনায় মরত তাহলে আগে প্রশ্ন হত, যে ধরনের

দুর্ঘটনা ঘটল, তা ব্রতী সাবধান হলে, এড়ানো যেত কিনা ! তারপর প্রশ্ন হত, যে পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনা ঘটল, তা কোন ভাবে এড়ানো যেত কিনা ! সুজাতার যদি দিব্যনাথের মত কোষ্ঠীতে বিশ্বাস থাকত তবে প্রশ্ন হত কোষ্ঠীতে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কোন ইঙ্গিত ছিল কিনা ! ইঙ্গিত থাকলে তা প্রতিরোধের কোন নিদান ছিল কিনা !

ব্রতী যদি দণ্ডনীয় কোন দুরপরাধ করতে গিয়ে নিহত হত, তাহলে প্রশ্ন হত—এ বাড়ির ছেলে হয়ে কার দোষে, কোন সঙ্গে পড়ে ব্রতী অপরাধী হল ! কোন কোন প্রতিষোধক ব্যবস্থা করলে ব্রতীর এই পরিণতি এড়ানো যেত !

ব্রতী ত এর কোন কোঠাতেই পড়ে না। অপরাধের মধ্যে ব্রতী এই সমাজে, এই ব্যবস্থায় বিশ্বাস হারিয়েছিল। ব্রতীর মনে হয়েছিল যে পথ ধরে সমাজ ও রাষ্ট্র চলেছে সে পথে মুক্তি আসবে না। অপরাধের মধ্যে ব্রতী শুধু স্লোগান লেখেনি, স্লোগানে বিশ্বাসও করেছিল। ব্রতীর মুখাগ্নি পর্যন্ত দিব্যনাথ ও জ্যোতি করেন নি। ব্রতী এমনই সমাজবিরোধী যে ব্রতীদের লাশ কাঁটা-পুকুরে পড়ে থাকে। রাত হলে পুলিশী হেফাজতে গাদাই হয়ে শ্মশানে আসে। তারপর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

রাতে লাশ জ্বলে। যারা শ্রাদ্ধশান্তিতে বিশ্বাসী, তারাও শাস্ত্রের নিয়মে সকালে শ্রাদ্ধ করতে পারে না। তাদের বসে থাকতে হয় লাল, স্ফীত চোখে সারাদিন। তারপর রাতে একটা ঘেটো-বামুনের দোর ধরতে হয়।

বামুনটা মাথা পিছু থোক টাকা নিয়ে রাতেভিতে শ্রাদ্ধ সেরে দেয় ঝটপট।

ব্রতী স্লোগান লিখেছিল। পুলিশ যখন ওর ঘর তল্লাশ করে তখন সুজাতা দেখেছিলেন স্লোগানের বয়ান সব। ব্রতীর হাতে লেখা।

কেননা জেলই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়।

বন্দুকের নল থেকেই……

এই দশক মুক্তির দশকে পরিণত হতে চলেছে…

ঘৃণা করুন! চিহ্নিত করুন! চূর্ণ করুন মধ্যপন্থীকে।

…অজ ইয়েনানে পরিণত হতে চলেছে।

শুনেছিলেন ব্রতীরা বয়ান লেখে, তারপর দেওয়ালে লেখে। রাতেভিতে অন্ধকারে লেখে। আবার কালুর মত মরিয়া হলে বেলা এগারোটায়, পুলিশ পাহারায় যখন পাড়া ঘেরাও, রাস্তায় যখন তপনের রক্ত শুকোয় নি, তখনই লালরঙের পোঁচড়া টেনে সম্ভ্রান্ত কোন বাড়ির পরিষ্কার দেওয়ালে লেখা, লাল বাংলার লাল কমরেড লাল তপনের লালরক্তে…বাজার পুড়িয়ে মা…

লিখতে লিখতে কালুও গুলি খায় বলে শেষ শব্দটা শেষ হয় না। ওই রকমই থেকে যায়।

ব্রতীরা এই এক নতুন জাতের ছেলে। স্লোগান লিখলে বুলেট ছুটে আসে জেনেও ব্রতীরা স্লোগান লেখে। কাঁটাপুকুর যাবার জন্যে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দেয়।

সুজাতা ত ব্রতীকে কোন রকম অপরাধীর কোঠাতে ফেলতে পারেন নি?

ব্রতীর জন্যে, কাঁদতে কাঁদতেই জ্যোতি ও দিব্যনাথ তাঁকে বুঝিয়েছিলেন, এ সমাজে বড় বড় হত্যাকারী, যারা খাবারে-ওষুধ, শিশু-খাদ্যে ভেজাল মেলায় তারা বেঁচে থাকতে পারে। এ সমাজে নেতারা গ্রামের জনগণকে পুলিশের গুলির মুখে ঠেলে দিয়ে বাড়ি গাড়ি পুলিশ পাহারায় নিরাপদ আশ্রয়ে বেঁচেথাকতে পারে। কিন্তু ব্রতী তাদের চেয়ে বড় অপরাধী। কেননা সে এই মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও স্বার্থান্ধ নেতাদের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছিল। এই বিশ্বাসহীনতা যে বালক, কিশোর বা যুবকের মনে ঢুকে যায়, তার বয়স বার—ষোল—বাইশ যাই হক, তার শাস্তি নিশ্চিত মৃত্যু।

তার এবং তাদের শাস্তি নিশ্চিত মৃত্যু। যারা মেরুদণ্ডহীন,

সুবিধাবাদী—হাওয়া বদল বুঝে মত বদলানো শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর সমাজকে বর্জন করে।

তাদের শাস্তি মৃত্যু। সবাই তাদের হত্যা করতে পারে। সব দল ও মতের লোকেদের এই দলছাড়া তরুণের হত্যা করার নির্বাধ ও গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। আইন, অনুমতি, বিচার লাগে না।

একা অথবা যূথবদ্ধভাবে এই বিশ্বাসহীন তরুণদের হত্যা করা চলে। বুলেট-ছুরি-দা-বর্শা-সড়কি যে কোন অস্ত্রে যে কোন সময়ে শহরের যে কোন অঞ্চলে, যে কোন দর্শক বা দর্শকদের সামনে।

জ্যোতি আর দিব্যনাথ এসব কথা সুজাতাকে পাখিপড়া করে বোঝান। কিন্তু সুজাতা মাথা নেড়েছিলেন।

না।

ব্রতীর মৃত্যুর আগের প্রশ্ন হল কেন ব্রতী বিশ্বাসহীনতার ব্রতকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করেছিল?

ওর মৃত্যুর পরের প্রশ্ন হল ব্রতী চ্যাটার্জীর ফাইল বন্ধ হল বটে কিন্তু ওকে হত্যা করে কি সেই বিশ্বাসহীনতার প্রজ্বলন্ত বিশ্বাসকে শেষ করে দেওয়া গেল? ব্রতী নেই, ব্রতীরা নেই। তাতেই কি শেষ হয়ে গেল সব?

প্রশ্ন হল ব্রতীর মৃত্যু কি নিরর্থক? ওর মৃত্যুর মানে কি তবে একটা বিরাট 'না'?

সব কী অলীক ছিল? অনস্তিত্ব? ওর বিশ্বাস? ওর ভয়-হীনতা? ওর দুর্বার আবেগ? মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সমুদ্র বিজিত, পার্থ আর লালটুকে সাবধান করবার জন্যেই যোলই জানুআরী নীল শার্ট পরে সুজাতাকে ছেলে ভুলিয়ে বেরিয়ে যাওয়া? যাবার আগে হঠাৎ সুজাতার দিকে তাকানো? দেখে নেওয়া? সুজাতার সুন্দর অভিজাত, প্রৌঢ় মুখের প্রতিটি বেদনার রেখা দেখে মনে এঁকে নেওয়া?

সুজাতা মাথা নেড়েছিলেন। ঘর বন্ধ করে বেরিয়ে এসেছিলেন।

চাবিটা সেদিন থেকে ওঁর কাছেই থাকে। ওঁর ব্যাগে। আজ দুবছর ধরে রাতে উঠে আসেন সুজাতা! ব্রতীর ঘর ঝাঁট দেন, ধুলো ঝাড়েন। বিছানা আবার পেতেছেন সুজাতা। জুতো রেখেছেন আলনার নীচে। জামাকাপড় গুছিয়েছেন। তাঁর মত ক' হাজার ছেলের মা সকলকে লুকিয়ে ছেলের জামায় হাত বোলায়, ছেলের ছবিতে আঙুল বোলায়?

ব্রতীর ঘরে বসে থাকেন সুজাতা। মনে মনে ব্রতীর সঙ্গে কথা বলেন। চোখ বুজে ভাবেন ব্রতী কাছে আছে। ভাবেন কত মা কত ছেলেকে এমনি করে লুকিয়ে কাছে ডাকে, কাছে পেতে চায়?

ব্রতীর সঙ্গে কথা বলেন সুজাতা। কখনো ব্রতী উত্তর দেয়, কখনো দেয় না।

জ্যোতির ঘরে টেলিফোন বাজছে। ওটা ধরতে গিয়েই এত কথা মনে পড়ল সুজাতার।

সমু আর লালটু, বিজিত আর পার্থর বাড়িতে টেলিফোন নেই। টেলিফোন বাজিয়ে ওদের বাড়ির লোকের ঘুম ভাঙাবে না। আজ সমু, বিজিত আর পার্থের মা কি ভাবছেন? আজ সকালে?

বিনি শ্লথ পায়ে নাইলনের নাইটি পরে দরজা খুলে দিল। ওর চোখে মুখে বিরক্তি। এত তাড়াতাড়ি বিনি ঘুম থেকে উঠতে চায় না। ওর ঘুম ভাঙে না।

নিয়মিত ঘুম আর বিশ্রাম জ্যোতি আর বিনির খুবই দরকার। অত্যন্ত প্রেমাসক্ত সুজাতার বড়ছেলে আর বউ। সুমনের আটমাস বয়স থেকেই অবশ্য ওদের খাট ও বিছানা আলাদা, তবু ওরা অত্যন্ত প্রেমাসক্ত দম্পতি বলে নাম আছে। রক্তমাংসের সুখকে সুজাতা খুব দামী বলে জানতেন। বিনিরা রক্তমাংসের সুখকে প্রেম থেকে ব্যবচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

ওদের প্রেম অন্যরকম। ওদের বিবাহবার্ষিকীতে খুব উদ্দাম পার্টি হয়। একসঙ্গে ঘোরে দুজনে, বেড়াতে যায়। সুজাতা

শুনেছেন বিনি ক্লাবে গেলে জ্যোতি ছাড়া কারো সঙ্গে নাচে না। ফলে সমাজে বিনির খুব সুনাম। সুজাতা ফোন তুললেন,

কে ?

আমি নন্দিনী।

নন্দিনী !

হ্যাঁ, আমি ফিরে এসেছি।

কবে ?

পরশু।

ও।

আপনার সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া দরকার। আপনার ওখানে আমি যাব না। আপনি কি ব্যাঙ্কে যাবেন আজ ?

আজ আমি যাব না নন্দিনী। আজ আমার ছোটমেয়ে তুলির এনগেজমেণ্ট।

তাহলে ?

তুমি বল কোথায় গেলে দেখা হবে। ঠিক সন্ধ্যাটা বাদ দিয়ে আমি অন্যসময় যেতে পারি।

চারটের সময় ?

যেতে পারি। কোথায় যাব বল ?

একটা ঠিকানা দিচ্ছি। আপনার বাড়ি থেকে বেশি দূরে হবে না।

বল।

নন্দিনী ঠিকানা বলল। সুজাতা ফোন নামিয়ে রাখলেন। নন্দিনী ! ব্রতী নন্দিনীকে ভালবাসত। কিন্তু নন্দিনীকে কখনো দেখেন নি সুজাতা।

জ্যোতির দিকে তাকালেন। ঘুমোলে, একমাত্র ঘুমোলেই জ্যোতির মুখে সুজাতা ব্রতীর মুখের আদল দেখতে পান।

বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। বারান্দায় বেরোতেই বেশ শীতশীত করল ! নন্দিনী আর ব্রতী কি একটা কবিতার কাগজ বের করেছিল ?

ওরা একসঙ্গে নাটক করেছিল, সুজাতার জলবসন্ত হয়, তাই যাওয়া হয় নি। বাড়ি থেকে আর কেউই যায় নি। শুধু হেম বলেছিল, ছোটোখোকা অনেক হাততালি পেয়েছে, জানলে গো মা। সবাই খুব সুখ্যেত করেছে।

হেমই গল্প করত ব্রতীর সঙ্গে। সুজাতার কাছে যখন ব্রতী অচেনা হয়ে যাচ্ছিল, মাঝে মাঝে ওর মুখ দেখে সুজাতা কথা বলতেও ভয় পেতেন, তখনো হেম বলতে পারত, রাজকাজজিতে যাচ্ছ তা জানি, এটুকু খেয়ে উদ্ধার করে যাও বাপু।

সেই সে দীঘা যাচ্ছি, বলে ব্রতী দীঘার পথে বাস থেকে নেমে অন্য জায়গায় যায়, হেমই তখন ওর সুটকেস গোছগাছ করে দিয়েছিল।

হেম বলেছিল ছোটখোকার সঙ্গে এট্টা মেয়ের ভাব আছে গো মা! ঠাকুর দেখে এয়েছে। ছোটখোকা বেরুলে মেয়েটা পথের ধারে দাঁইড়ে থাকে। তা বাদে দুজনা একসঙ্গে চলে যায়। মেয়েটা কালোপানা।

সেই নন্দিনী! সুজাতার বুক ধড়ফড় করছে কেন? ব্যারালগান খেয়ে বেশি সময় শুয়ে থাকেন নি বলে। নন্দিনী ফোন করেছে বলে?

বাথরুম থেকে সেজেগুজে বেরিয়ে এল বিনি। ঘাড় অবধি ছাঁটা রুক্ষ চুল নীল শাড়ির ওপর নীল নাইলনের কার্ডিগান। রঙে রং মিলিয়ে পরতে কখনো ভুল হয় না বিনির। দীপার হয় না, তুলিরও হয় না। বিনিকে বেশ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে।

কে ফোন করেছিল মা?

নন্দিনী।

নন্দিনী!

ব্রতীর বন্ধু।

বিনির মুখ কৌতূহলে ভরে গেল।

নিচে যাচ্ছ কেন মা?

কি হবে না হবে দেখি ! তুমি সুমনকে তোল। ওর ত ইস্কুল আছে। বাস আসবে।

নিচে তুলিই গেছে।

সুজাতা হাসলেন। আজ তুলির এনগেজমেণ্ট। আজও বিশ্বাস করতে পারে না ও গিয়ে তদারক না করলেও এ বাড়িতে সকালের চা ব্রেকফাস্ট, দুপুরের রান্না, বিকেলের ঘর সাজানো সব হবে। কাউকে বিশ্বাস করে না তুলি।

ষোল বৎসর বয়সে ক্রাফ্‌ট শিখতে গেল তুলি লেখাপড়া ছেড়েই। সেই সময় থেকেই সংসারের ভার ও নিল। আসলে সি. এ. ফার্ম দাঁড়িয়ে যাবার পর দিব্যনাথ সুজাতাকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। সুজাতা শোনেন নি। শাশুড়ি জীবিত ছিলেন ব্রতীর আটবছর অবধি। ততদিন পর্যন্ত সুজাতার একখানা কাপড় নিজের শখে কিনবার অধিকার ছিল না।

সেই জন্য, এই ব্যাঙ্কে যাওয়া আসা, নিজের মত নিজের একটা জীবন খুঁজে পাওয়া, সবকিছু অত্যন্ত দামী হয়ে ওঠে সুজাতার কাছে। তাই উনি কাজ ছাড়েন নি।

তুলি ওর ঠাকুমার চেহারা ও স্বভাব পেয়েছে। সুজাতা যে কাজ ছাড়েন নি সে জন্যে ওর বাবা আর ঠাকুমার খুব রাগ হয়। আসলে সুজাতা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চান, ঘর সংসার তাঁর ভাল লাগে না, ভাল লাগে না ছেলেমেয়ের বোঝা, এসব কথা মা ও ছেলে সব সময় বলতেন।

তুলিও বলত, এখনো বলে, যে বাড়ির গিন্নি দিনে দশঘণ্টা বাইরে থাকেন, সে বাড়ির মেয়েকে বাধ্য হয়েই করতে হয় সব। আমি না করলে কোন কাজ হয় ?

সর্বদা অসন্তুষ্ট তুলি, অপ্রসন্ন। একটু চা ঢালা, কি রান্না হবে বলে দেওয়া এ-সব কাজ ও করে শহীদের মত মুখ করে। আশা করা যায় বিয়ে হলে ওর স্বভাব শুধরে যাবে।

ক্রাফ্‌ট শেখবার পর বন্ধুর সঙ্গে শাড়ি ছাপাবার দোকান করতে গিয়েছিল তুলি। সেই সূত্রে টোনি কাপাডিয়ার সঙ্গে আলাপ হয়। আজ ব্রতীর জন্মদিনে তুলির এনগেজমেণ্ট ঘোষণা করবার সিদ্ধান্তটা টোনির মার। মিসেস কাপাডিয়ার গুরু সোয়ামীজি আমেরিকায় থাকেন। তিনি জানিয়েছেন এই দিনটিই প্রশস্ত। তাঁর ক্যালেণ্ডারে। সোয়ামীর শিষ্যরা সোয়ামীর ক্যালেণ্ডার মেনে চলেন। সে ক্যালেণ্ডারে কোন ছুটিছাটা নেই। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই হল কর্ম এবং ধ্যানের দিন। টোনির কথা ভাবতে গিয়ে দিবানাথ বা তুলি সুজাতার মত নিতে ভুলে যায়।

নিচে নামতেই সুজাতা বুঝলেন তুলি বহুক্ষণ ওঁর সঙ্গে মনে মনে ঝগড়া করছে। আজ, ওর জীবনের একটা বিশেষ দিন। কিন্তু সুজাতা যেন দিনটাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তাই ওর রাগ।

তুমি কি খাবে মা?

একটু লেবুজল।

কেন? ব্যথা বেড়েছে?

না। এখন আর নেই।

জানি না তুমি এরকম চান্‌স নিচ্ছ কেন। অ্যাপেনডিক্‌স অপারেশন আজকাল এখন ডালভাত।

সবসময় নয়। অ্যাপেনডিক্‌স অপারেশন হওয়া উচিত ইলেক্‌টিভ। অ্যাপেনডিক্‌সকে ফুলতে বা পেকে উঠতে না দিয়ে অল্পস্বল্প ব্যথা হলেই কেটে ফেলা উচিত। সুজাতার ক্ষেত্রে তা হয়নি। তাছাড়া ডাক্তার সন্দেহ করেন সুজাতার অ্যাপেনডিক্‌স হয়ত গ্যাংগ্রীনাস। সময়ে না কাটলে গ্যাংগ্রীন দাঁড়াতে পারে। ফেটে গেলেও বিপদ হতে পারে। অথচ সুজাতার হার্ট তেমন সবল নয়। শরীর রক্তশূন্য, তাই অপারেশন করা ঠিক এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। কালই সুজাতা এসব কথা জেনে এসেছেন। তবে তুলিকে সে কথা বললেন না। বললেন,

করাব অপারেশন।

কবে ?

তোর বিয়েটা হয়ে যাক।

বিয়ে ত এপ্রিলে হবে।

হয়ত তার আগেই করাব। হেম! হেম!

কেন মা ?

আমায় একটু লেবুজল দিও।

সুজাতা টেবিলে বসলেন।

এত ভোরে কে ফোন করেছিল ?

নন্দিনী।

তুলির মুখ লাল হল। ভুরু কুঁচকে গেল অসন্তোষে। ও ঘটাং ঘটাং করে টি-পটের ভেতরে চামচ নেড়ে দেখল লিকার কতটা গাঢ় হল। তারপর বলল, একটা ঘণ্টা বাজাবার নিয়ম করলে পার। সবাই একসময়ে চা খেয়ে যাবে। যার যখন ইচ্ছে আসে এতে লোকজনের কষ্ট আমারও অসুবিধে।

সুজাতা কৌতূহলে দেখতে লাগলেন তুলিকে। ঠিক এইরকম গলায় কথা বলতেন শাশুড়ি। শাশুড়ি ছেলেমেয়েদের আরাম করা, ইচ্ছেমতন গল্প করে খাওয়া, এসব দেখতে পারতেন না। সর্বদা তাড়না করতেন অসন্তোষে, বিরক্তিতে। সবাই তাঁর অনুশাসন মেনে নিয়েছিল। একা ব্রতী সেই শৈশবেও তাঁর শাসন মানে নি। দেরি করে ঘুম থেকে উঠত। নিয়মমাফিক টেবিল থেকে খাবার তুলে ফেলা হত। ব্রতী রান্নাঘরে গিয়ে হেমের কাছে পিঁড়িতে বসে খাবার খেয়ে নিত।

আশ্চর্য বাড়ি! আশ্চর্য ডিসিপ্লিন!

তুলি চাপা অসন্তোষে বলল। এখনি এই আটাশ বছর বয়সেই এত অসন্তোষ তুলির! এখনো ত জীবনের কতখানি পড়ে আছে সামনে।

জ্যোতি রাত করে শোয়, ওকে তাড়াতাড়ি তুলে কি হবে ? তোর বাবা চা খান না। ঘোল খাবেন…

সে আমি ওর ম্যাসাজিস্ট চলে গেলেই পাঠিয়ে দিয়েছি। বাবার কথা হচ্ছে না।

বিনি ঠাকুরঘরে ফুলজল দিয়ে আসছে।

যতসব ন্যাকামি।

ন্যাকামি কেন হবে? তোর ঠাকুরমা নিয়মিত পুজোপাঠ করতেন। আমার ভাল লাগত না। নিয়মরক্ষে দুটো ফুল ফেলে দিতাম। বিনির ভাল লাগে, পুজো করে। এতে ন্যাকামি কোথায় দেখলি?

জানি না বাবা। বিলেতে জন্ম, সেখানে ষোলবছর অব্দি কাটিয়ে এত ভক্তি কোথা থেকে আসে জানি না।

বিলেতে ওর বাবা বাড়ি করেছিল, সেখানে থাকত। বিলেতে বড় হওয়ার সঙ্গে ঠাকুরঘরে ফুল-জল দেওয়ার কি বিরোধ আছে কোন? আমি ত দেখতে পাই না।

ভক্তি থাকলে বুঝতাম। ওর কাছে ঠাকুরঘরটা একটা ইনটেরিয়র ডেকরেশন।

তুই তো সোয়ামীর মন্দিরে যাস পার্ক স্ট্রীটে।

সেটা অন্য জিনিস মা।

আমার ত মনে হয় না। যার যাতে বিশ্বাস করতে ভাল লাগে সে তাই বিশ্বাস করছে। তা বলে অন্যের বিশ্বাসটা ন্যাকামি, নিজের বিশ্বাসটা খাঁটি, তা হবে কেন?

ব্রতীও বলত। অন্যদের বিশ্বাসকে ব্যঙ্গ করত।

তোর সোয়ামীতে বিশ্বাস, বিনির ঠাকুরঘরে বিশ্বাস, দুটো মোটামুটি এক ধরনের জিনিস। ব্রতী যা বিশ্বাস করত, তার সঙ্গে অন্যদের বিশ্বাসে তফাত ছিল তুলি। ব্রতী ব্যঙ্গ করত বলেও আমার মনে পড়ছে না। তর্ক করত বলতে পারিস। তর্কে হেরে গেলে তুই রেগে যেতিস। রাগিয়ে দিয়ে ও মজা পেত।

বিশ্বাস করত বলছ কেন মা? বিশ্বাস ওর ছিল না।

তুলি! আমি ব্রতীর কথা তোর সঙ্গে আলোচনা করব না।

কেন ?

লাভ কি ? তুই ব্রতীকে জানিস না।

এখনও তুমি···

তুলি ! চুপ কর।

সুজাতার হাত কেঁপে গেল। গেলাসটা নামালেন। কয়েকটি অসহ মুহূর্ত। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সুজাতা বললেন, বিনিকে চা খেতে আসতে বল হেম।

তুলি, তাঁর আত্মজা, তাঁর দিকে অপরিচিত, হিংস্র চোখে তাকাল। অচেনা গলায় বলল,

আজ ভল্‌টে থেকে গয়না কি আমাকেই আনতে হবে ?

আমি যাব।

বিকেলে কি তুমি বাড়ি থাকবে ?

থাকব।

আশাকরি আজ তুমি টোনির বন্ধুদের সঙ্গে একটু সহজ ব্যবহার করবে।

তোমরা কি, তোমরা কি সরোজকেও ডাকছ ?

ডেকেছি। আসবে কিনা জানি না।

সরোজকে !

'সরোজ পাল। সরোজ পাল, তোমার ক্ষমা নেই। অক্ষম, অক্ষম আস্ফালন। দু'বছর ধরে সরোজ পাল এই ব্যাপক তদন্ত তল্লাসী ও শাস্তিবিধানের ভার লইয়াছেন। তাঁহার অসামান্য কর্মদক্ষতা ও নির্ভীকতার জন্য— !'

মুক্তির দশক, মুক্তির দশক ! সরোজ পাল শাল্গ্রীদের যুথবদ্ধ করছে। যুথপতির মত নির্দেশ, শ্যামা মা একবার রক্ত চান। সরোজ পাল। সুন্দর চেহারা, সুন্দর হাসি, সুন্দর উচ্চারণ, ইয়েস মিস্টার চ্যাটার্জি আই কোয়াইট অ্যাসিওর ইউ। মিসেস চ্যাটার্জি, আমি জানি, আমারও মা আছেন। সরোজ পাল। ইয়েস, সার্চ দ্য রুম।

না মিসেস চ্যাটার্জী, আপনার ছেলে সন্তান হয়ে মার কাছে গিছে বলেছিল। দীঘায় ও যায় নি। ব্রোক হিজ জার্নি। মিসগাইডেড ইয়ুথ। ইয়েস ও ক্যানসারাস গ্রোথ অন দ্য বডি অফ ডেমোক্রেসি। না মিঃ চ্যাটার্জী, কোন কাগজে বেরোবে না। আপনি টোনির ভাবি শ্বশুর, টোনি আমার···সরোজ পাল।

তুমি সুজাতাকে দেখেছ!

এনাফ ইজ এনাফ মা! আজ দুবছর ধরে বাড়িটাকে তুমি কবর করে রেখেছ। বাবা তোমার সামনে মুখ খোলেন না। দাদা অপরাধীর মত···এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেলে সবাই সেটা চাপা দিতে চেষ্টা করে। সেটাই স্বাভাবিক। ব্রতী ইজ ডেড। ইউ মাস্ট থিংক অব দ্য লিভিং। তুমি···

অত তাড়াতাড়ি চাপা দিতে চেষ্টা করে? লাশ সনাক্ত করবারও আগে। টেলিফোনে খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাপের মনে হয় না ছুটে চলে যাই? আগে মনে হয় গাড়িটা কাঁটাপুকুরের সামনে দাঁড় করানো উচিত হবে?

নাকি টেলিফোন আসবার অনেক আগেই ব্রতী ওর বাবা ও দাদার কাছে মরে গিয়েছিল। তাই সুজাতা অবিশ্বাস করেছিলেন, ওরা অবিশ্বাস করে নি? তাই দুজনেই ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল খবরটা চেপে দেবার জন্য ধরাধরি করতে।

সহসা সুজাতার মনে হল এ একটা উদ্ভট নাটক। তাঁরা সবাই এ নাটকের পাত্র-পাত্রী।

যদিও ব্রতী এ বাড়ির ছেলে, তবু, সে নৃশংস ও হিংস্রভাবে নিহত হলে তার বাপ, দাদা, দিদিরা আপন আপন সমাজের কাছে কিভাবে সে মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করবে, কি অসুবিধেয় পড়বে, সেকথা ব্রতী ভাবেনি বলে সুশৃঙ্খল ও সাজানো জীবনে ব্যাঘাত ঘটেছে। ব্যাঘাত ঘটেছে যার জন্যে, সে এখন মৃত। এখন এরা সুজাতাকে মনে মনে ব্রতীর দলে ফেলেছে! নিজেরা একটা আলাদা দল করছে।

হাজার হলেও বাপ্ দাদা, দিদিদের পক্ষে একথা বলা কষ্টকর—

দেখুন আমার ছেলে ছিল—

মি, মাই ব্রাদার ওয়াজ—

আমার ছোট ভাই একটা—

টোনি, ব্রতী—!

সুজাতাকে ওরা বিপক্ষ দলে ফেলেছে। কেননা সুজাতা কোন সময়েই তাঁর সুশৃঙ্খল জীবন বিপর্যস্ত হল এজন্যে ব্রতীকে দোষ দেন নি। দোষ দেন নি, বুক চাপড়ে কাঁদেন নি, এদের কারো বুকে মাথা রেখে আকুল হন নি। প্রথমেই তাঁর মনে হয়েছে যারা আগে নিজের কথা ভাবে, তাদের কাছে ব্রতীর কথা বলে তিনি সান্ত্বনা খুঁজবেন না। ব্রতীর বাবা, দিদিদের চেয়ে হেমকে তাঁর আপন মনে হয়েছে।

সুজাতার একথাও মনে হল, ব্রতী যেদিন থেকে বদলে যেতে শুরু করে, সেদিন থেকেই এরা ব্রতীকে বিপক্ষ দলে ফেলে দেয় মনে মনে। এরা যা যা করে, ব্রতী তা করত না। বড় হলে উত্তর-জীবনেও ব্রতী তা করত না, এরা তা জানে। অতএব ব্রতী অন্য শিবিরের বাসিন্দা!

ব্রতী যদি জ্যোতির মত প্রচুর মদ খেত, নীপার বরের মত মাতলামি করত, ব্রতীর বাবা যেমন সেদিনও এক টাইপিস্ট মেয়েকে নিয়ে ঢলাঢলি করেছেন, তাই করত, ঝানু জোচ্চোর হত টোনি কাপাডিয়ার মত, দুশ্চরিত্র হত ওর দিদি নীপার মত, যে এক পিসতুত দেওরের সঙ্গে প্রায় বসবাস করে; তাহলে ওরা ব্রতীকে বিপক্ষ মনে করত না।

অন্ততঃ ওরা যদি ব্রতীকে দেখে এ ভরসা পেত, যে বড় হয়ে ব্রতী ওদের মতই হবে, তাহলেও ওরা ব্রতীকে বিপক্ষ মনে করত না।

ব্রতী এর কোনটা করার দিকে প্রবণতা দেখায় নি। স্বামী, সন্তান, জামাই সবাই এসব করছে বলে সুজাতাও কোনদিন মনে করেন নি, তিনি বিশেষ করে অসুখী। প্রথমত, যা ঘটে তা মেনে নেন, ওই তাঁর শিক্ষা, জীবন থেকে পাওয়া। দ্বিতীয়ত, তাঁর

কোনদিন মনে প্রশ্ন ওঠে না, প্রশ্ন করবার নৈতিক অধিকার যে তাঁরও আছে, তা সুজাতা জানেন না। দুঃখ পেয়েছেন, খুব দুঃখ পেয়েছেন। দিব্যনাথ চিরকাল বাইরে মেয়েদের নিয়ে নোংরামি করেছেন। শাশুড়ির তাতে সস্নেহ প্রশ্রয় ছিল। তাঁর ছেলে পুরুষ বাচ্চা, তাঁর ছেলে স্ত্রৈণ নয়। সুজাতা দুঃখ পেয়েছেন তারপর ভেবেছেন পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন সুখী কে হয়?

কিন্তু ব্রতী অন্যরকম ছিল। খুব ছোটবেলাতেও ওকে মিথ্যে বলে ভোলানো যায় নি। যুক্তি দিয়ে বোঝালে ও কথা শুনত। শুনতে হবে বলে দাবড়ালে কথা শুনত না। ও যখন বড় হতে থাকল, তখন ওর মধ্যে সুজাতা স্বামী ও অন্য সন্তানদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক একটা মানবজগৎ দেখতে পেলেন।

ওর সঙ্গে বই পড়ে, ওকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় বেড়িয়ে, ওর বন্ধুদের বাড়িতে ডেকে গল্পগুজব করে সুজাতা ক্রমেই ওর মধ্যে ডুবে যেতে লাগলেন। ব্রতীই যেন ওঁর বেঁচে থাকার একমাত্র ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়াল। সম্ভবত, সম্ভবত ব্রতীর বিষয়ে সুজাতা অত্যন্ত অধিকারপ্রবণ হয়ে পড়েন।

একা ব্রতীর জন্যে সুজাতা স্বামীকে, শাশুড়িকে অমান্য করেছেন। অর্থহীন শাসন, আর স্বেচ্ছাচারী প্রশ্রয়, যা অন্য সন্তানেরা ভোগ করেছে তা ব্রতীকে ভোগ করতে দেন নি। অন্য সন্তানদের শাশুড়ি সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেছিলেন। ব্রতীর বেলা সুজাতা দখল ছাড়েন নি। বেশি জেদি, বেশি অনুভূতিপ্রবণ, বেশি কল্পনাপ্রবণ ব্রতীকে সুজাতা ছায়ায় মায়ায় বড় করেছিলেন। স্বামী ও শাশুড়ির আধিপত্যের উত্তাপ থেকে ব্রতীকে বাঁচিয়ে চলার জন্যে সুজাতাকে খুব কষ্ট করতে হয়েছিল।

সেই জন্যেই কি এরা এখনও ক্ষমাহীন? না ব্রতীর বিষয়ে এদের মনে মনে কোন পাপবোধ আছে? সেটা ঢাকবার জন্যেই এত রুক্ষ তুলি, এত অপরাধী ও সংকুচিত দিব্যনাথ, এমন নম্র জ্যোতি?

মুখে সুজাতা এর কোন কথাই বললেন না। বললেন, তুলি তুই খুব সুখী হবি।

দুপুর

দুই লক্ষ লোকের বসতিস্থল এই কলোনিটা কোন পরিকল্পনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি। পশ্চিমবঙ্গে এটাই প্রথম জবরদখল কলোনি। প্রথমে, আদিতে, এখানে জায়গা ছিল জমিদারের, কয়েকটা ফুলবাগান, অসংখ্য ডোবা ও পুকুর, কয়েকটি ছোট গ্রাম।

সাতচল্লিশ সালের পর জনসংখ্যার চাপে অঞ্চলটার ম্যাপ পালটে গেল। মাঠ, বাদা, নারকেল বাগান, ধানক্ষেত, গ্রাম সব গ্রাস করে গড়ে উঠল কলোনি।

এ অঞ্চল থেকে চিরকাল বিরোধীপক্ষ ভোট পেয়েছে। সেইজন্যই বোধহয় সরকার এখানে একটি পাকা রাস্তা, স্বাস্থ্য চিকিৎসাকেন্দ্র, পর্যাপ্ত সংখ্যায় নলকূপ, একটি বাস রুট, কিছুই করেন নি। যাঁরা এই দু'দশকে অবস্থা ফিরিয়ে ধনী হয়েছেন তাঁরাও কিছুই করেন নি।

এতদিনে সি. এম. ডি. এ. তৎপর হয়েছে বলে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে।

এখন ত আর কোন অশান্তি নেই, কোন ভয় নেই। এখন আর হঠাৎ দোকানবাজারে ঝাঁপ পড়ে না, বাড়িকে বাড়ি দরজা বন্ধ হয় না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায় না রিকশাচালক, নেড়িকুকুর, পথচারী। এখন আর সহসা শোনা যায় না বোমা ফাটার শব্দ, মার-মার, হই-হই-হল্লা, মরণার্তের গোঙানি, ঘাতকের উল্লাস।

এখন আর ছুটে যায় না কালোগাড়ি, হেলমেট পরা পুলিশ ও মিলিটারি বন্দুক উঁচিয়ে তাড়া করে বেড়ায় না কোন আর্ত কিশোরকে। এখন আর চোখে পড়ে না ভ্যানের চাকায় দড়ি দিয়ে বাঁধা জীবন্ত শরীর খোয়ায় আছড়াতে আছড়াতে টেনে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য।

এখন রাস্তায় রাস্তায় রক্ত, কোন মায়ের কণ্ঠে আর্ত বিলাপ অনুপস্থিত। দেওয়ালের লেখাগুলি পর্যন্ত মুছে গেছে নতুন লেখার নিচে। অনেক, অনেক দিন বাঁচুন কমরেড—মজুমদার। বিপ্লবী—তোমাকে ভুলব না—পল্লীর কিশোরদের নিষ্ঠুর ঘাতকের ক্ষমা নেই —সব লেখা চাপা পড়ে গেছে বিজয়ীর উদ্ধত জয় বন্দনার নিচে।

এখন আর মরতে মরতে কোন কিশোর-কণ্ঠ চেঁচিয়ে স্লোগান দেয় না। আড়াই বছরের বিশৃঙ্খলা, যা এখানকার জীবনের সুশৃঙ্খল নিয়মকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল, তার কোন চিহ্ন নেই।

সুখী ও শান্তিপ্রিয় পরিবারগুলি আবার ফিরে এসেছে। এখন দেখা যায় চালের অবাধ চোরাই কারবার, অহোরাত্র সিনেমার ম্যারাপ, নররূপী দেবতার মন্দিরের সামনে মুক্তিকামী জনতার উন্মত্ত ভিড়।

সে দিনের ঘাতকরা এখন আংরাখা বদল করে নতুন পরিচয়ে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। একটা অধ্যায়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। দাঁড়ি। এখন মহোপন্যাসের নতুন অধ্যায় শুরু।

শুধু সরু পথগুলির মোড়ে মোড়ে স্মৃতিফলকগুলো শরীরের দৃশ্য জায়গায় কুৎসিত ক্ষতচিহ্নের মত নিরন্তর স্মারক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে সব স্মৃতিফলকে সমু-বিজিত-পার্থ-লালটুদের নাম নেই। ব্রতীর নাম ত থাকবেই না। ওর নাম, ওদের নাম শুধু কয়েকটি হৃদয়ে বেঁচে আছে। হয়ত।

সমুদের বাড়িতে বসেছিলেন সুজাতা। ভল্‌ট থেকে গয়না আনা হয়ে গেছে। গয়না তাঁর ব্যাগে। নীপা, বিনি, তুলি, ব্রতীর ভাবীবউ, চারজনের জন্যে একসময়ে গয়নাগুলো ভাগ করা হয়েছিল।

নীপা ও বিনিকে যা দেবার তা দিয়ে দিয়েছেন।

তুলি বলে, ব্রতীর ভাগের গয়নাগুলো ওকে দেওয়া উচিত।

নীপার মেয়ে, জ্যোতির ছেলের নামে কিছু রেখে সবই হয়ত তুলিকেই দিয়ে দেবেন। সুজাতা নিজে কোনদিনই হাতে সরু বালা,

কানে ফুল, গলায় একটা সরু হার ছাড়া কিছু পরেন না। ব্রতী হবার পর থেকে রঙিন শাড়ি পরেন নি।

এখন তাঁর চেহারা ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, সমুর মা ওঁর সামনে বসে নীরবে কাঁদছিলেন। রোগা, কালো মুখ ভেসে যাচ্ছিল চোখের জলে। এক বছরে ওঁর চেহারা আরো জীর্ণ হয়ে গেছে। পরনে ময়লা মোটা থান।

বড় জীর্ণ সমুদের বাড়ি, খোলার চালে শ্যাওলা, বেড়ার দেওয়াল ভাঙা, পিসবোর্ডের তালিমারা। তবু, আজ দুবছর ধরে একমাত্র এখানে এলেই সুজাতা শান্তি পান। মনে হয় নিজের জায়গায় এলেন।

প্রথমবার ওঁকে দেখে সমুর দিদি কেঁদে ফেলেছিল। এবার ওঁকে দেখেই ওর ভুরু কুঁচকে গেল। সমুর মৃত্যুর পরেই ওর বাবা মারা যান। তখন থেকে সমুর দিদিকেই উদয়াস্ত ছেলে পড়িয়ে সংসার চালাতে হয়েছে। চিতার আগুনে শরীরের স্নেহ পদার্থ পুড়ে যায়। সংসারের আগুনে সমুর দিদি পুড়ে ঝলসে গেছে। এখন ওর চোখে-মুখে রুক্ষতা, রাগ। সমু ওকেই মেরে রেখে গেছে। ও বাড়ির একমাত্র ছেলে ছিল। ও ভাল কলেজে পড়বে বলে সমুর দিদিকে ওদের বাবা পড়ার খরচ দেন নি। ও নিজের পড়ার খরচ ছেলে পড়িয়ে চালাত।

ওঁর দিকে রুক্ষ চোখে তাকিয়ে কথা না বলে সমুর দিদি বেরিয়ে গেল। সুজাতা বুঝলেন ওই এখন সংসারের কর্তা। ও আর চাইছে না সুজাতা ওর ভায়ের কথা মনে করিয়ে দিতে বছর বছর এখানে আসেন। বড় অসহায় মনে হল নিজেকে। ওর দিকে সকাতরে তাকালেন। বলতে ইচ্ছে হল, এই আসা যাওয়ার দোরটা বন্ধ কর না। বলতে পারলেন না। সমুর দিদি বেরিয়ে গেল।

সমুর মা কাঁদছিলেন। সুজাতা চুপ করে বসেছিলেন।

অন্না কয় কাইন্দনা মা! হেয় আর কি ফিরিব? কয় তুমি ত তবু নি ভাল আছ। পার্থের মায়ে, দিদি, পার্থরে হারাইল।

আবার পার্থের ভাইটা দেহেন হেই অইতে ঘরে আইতে পারে না। হেয়া গিয়া রইছে তার মাসির বাড়ি, কুনখানে বা।

এখনো ফেরেনি ?

না দিদি। যারা গেল তারা ত গেলই। যারা জীউটুকু ধইরা আছে, তারাও কুন-অ-দিন ঘরে ফিরব না। ও বিধির কি বিধান তাই কয়েন দিদি।

সমুর মা কাঁদতে লাগলেন।

প্রথমবার, একবছর পুরতে, এখানে আসার আগে খুব ইতস্তত করেছিলেন সুজাতা। সমুর মা তখন ক'মাস হল বিধবা হয়েছেন।

পাড়ায় ঢুকে সমুর নাম বলতে লোকজন, পাড়ার ছেলেরা অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়েছিল। প্রথমটা কেউ বলতে চায়নি। শেষে একজন বলেছিল, দেখেন গিয়া। ওই বাড়িখান।

সুজাতার দামী সাদা শাড়ি, অভিজাত চেহারা, কাঁচাপাকা চুলঘেরা প্রৌঢ় মুখের বনেদীয়ানা দেখে সমুর মা হতভম্ব হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন।

আমি ব্রতীর মা।

একথা বলতেই, সমুরে! বলে মহিলা ডুকরে কেঁদে ওঠেন। সুজাতাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন উনি, আপনার পোলায় ত দিদি! ডাইকা জীবনডা দিল। অ ত আইছিল সমুগো সাবধান করতে। তা হেয় জানছিল সমু তারা চাইরজন পারায় আইয়া পড়ছে, বুঝি রাতটুকু কাটব না অগো। আইয়া যখন ব্রতী জিগাই সমু কোথা? আমি এট্টা কথা কইয়া চইলা যামু, আমি বললাম রাতে নি! কোলোনি দিয়া যাইতে পারবা ধন? রাতটুকু এহানে থাহ, বিয়ান না আইতে যাইও বাড়ি। ত অদের নি রাতটুকু কাটল? হেদিন দিদি এহানে আমার এই অতটুনি ঘরে সমু, পার্থ আর ব্রতী জরাজরি কইরা শুইয়া রইল।

কোন ঘরে?

এই ঘরে। ঘর আর কই দিদি? মাইয়া গেল বোনদের নিয়া

দাওয়ায়। ওই দাওয়াটুকু বেরায় ঘেরা, হেথানে রইল। এই ঘরে অরা রইল। আমি যাইয়া জানলায় বইয়া রইলাম, কে আসে দ্যাখব।

এখানে ছিল ব্রতী ?

হ দিদি। হেয় আছিল দরিদ্র দোকানী, পুঁজি আছিল না। বাজারে একখানা খাতা, পেনসিল, ছেলেটের দোকান দিছিল। এই ঘরখানা, তা কত কষ্টে তুলেছিল। তা পোলারা এক কোণে রইল। সমুর বাপেও জাগা, বিয়ান না আইতে অদের তুইলা দিব। ঐকোণে আমার ছিরা মাদুরে শুইয়া অগো কত কথা, কত হাসি। দিদি, ব্রতীর হাসি-খান আমার চক্ষে ভাসে গো। সোনার কান্তি পোলা আপনার।

ব্রতী এখানে আসত ?

কত ! আইত, বইত, জল দেন মাসিমা, চা দেন, কেমুন ডাইকা কইত।

ব্রতী এখানে আসত ! এখানে এসে চা খেত, গল্প করত, সময় কাটাত !

সমুর মাকে, ওদের ঘর, দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার কাটা ছবি, ভাঙা পেয়ালা, সব যেন নতুন চোখে দেখেছিলেন সুজাতা।

ব্রতী তাঁর রক্তের রক্ত, যাকে জন্ম দিতে গিয়ে তাঁর প্রাণসংশয় হয়েছিল, যে তাঁর কাছে ক্রমশঃ অবোধ্য হয়ে গিয়েছিল, অচেনা, তার সঙ্গে সুজাতার যেন নতুন করে পরিচয় শুরু হয় সেই মুহূর্ত থেকে।

স্বপ্নে ত তিনি কতবার ব্রতীকে দেখতে পান। নীল শার্ট পরেছে ব্রতী, চুল আঁচড়াচ্ছে। তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে ব্রতী।

গভীর অভিনিবেশে দেখে নিচ্ছে তাঁর মুখ।

কত বিনিদ্র রাতের শেষে, যখন শুধু শারীরিক ক্লান্তিতে অবসন্ন সুজাতার চোখের পাতাকে পরাজিত করে ঘুম নামে, তখন ব্রতী সিঁড়ির নিচু থেকে ওঁর দিকে তেমনি গভীর চোখে চেয়ে থাকে। সুজাতা বলেন, ব্রতী তুই যাস না। ব্রতী চেয়ে থাকে। সুজাতা বলেন, আয় ব্রতী উঠে আয়। ব্রতী চেয়ে থাকে। কথা বলে না, ঠোঁটে হাসি থাকে না তখন।

কিন্তু এখানে ব্রতী কথা বলত, হাসত, বলত মাসিমা, চা করুন, জল দিন আগে।

সমুর মা বলেছিলেন, আমি বলতাম—তুমি কেন এমন কইরা হকল জলাঞ্জলি দিতেছ ধন! কি নাই তোমার? সভাউজ্জ্বল বাপ, বিদ্বান মা। হে কইত না কিছু। শুধা হাসত। আর হাসিখানা আমার চক্ষে নি ভাসে দিদি।

তখনই বুকে ধাক্কা লেগেছিল সুজাতার। ব্রতীর হাসি, সেই আশ্চর্য হাসি। তিনি ভেবেছিলেন সব স্মৃতি তাঁর একলার। ব্রতী সমুর মার বুকেও স্মৃতি রেখে গেছে তা তিনি জানতেন না কেন?

ব্রতী সেদিন বাড়িতেই ছিল। সারাদিন কি যেন সব লিখেছিল তেতলায় বসে; পরে সুজাতা দেখেছেন দেওয়ালে স্লোগান লেখার বয়ান সব। সে সব কাগজ ওরা তল্লাসী করবার সময়ে নিয়ে যায়, এখন বাড়ীতে নেই।

এখন বাড়িতে আছে ব্রতীর স্কুলের ও কলেজের বই, খাতা, প্রাইজের বই, সোনার মেডেল, দার্জিলিঙে বন্ধুদের সঙ্গে তোলা ছবি, দৌড়বার জুতো, খেলার কাপ। ব্রতীর জীবনের কয়েকটা বছরের স্মারক। সব মনে আছে সুজাতার, মা প্রাইজ পাব, তুমি যাবে না? ব্রতীর পাড়ার পার্কে গিয়ে বালক সংঘে ভর্তি হওয়া। গর্বভরে ছেলেদের সঙ্গে ড্রাম আর বিউগল বাজিয়ে স্বধীনতা দিবসে রাস্তা দিয়ে মার্চ করা, ফুটবল জিতে কাপ এনেছিল কিন্তু পা ভেঙে এসেছিল।

যে সময় থেকে বদলে যেতে শুরু করে সেই বছরখানেকের বই, কাগজ, ইস্তাহার, বিপ্লবের আহ্বান লেখা কাগজ, পত্রিকা, কিছু বাড়িতে নেই। সব ওরা ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে। সুজাতা শুনেছেন ওগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

সারাদিন বাড়িতে ছিল ব্রতী। ব্যাঙ্ক থেকে সুজাতা ফিরে ওকে বাড়িতে দেখে খুব অবাক হন। পরে বুঝেছেন সারাদিন ও একটা টেলিফোনের জন্য অপেক্ষা করছিল। ও জানত সমুরা ফিরে যাবে।

জানত, সমুদের নিষেধ করে পাঠানো হয়েছে। সমুদের নিষেধ জানাতে যে যায়, সে যে সমুদের কাছে যাবে না, পাড়ায় গিয়ে খবর দেবে, তা ব্রতী বোঝে নি। ফোন পেয়ে তবে বুঝেছিল সর্বনাশ হয়েছে।

এই করেই মরেছিল ওরা। বহুজনকে বিশ্বাস করে। যাদের বিশ্বাস করেছে তাদের কারো কারো কাছে চাকরি, নিরাপত্তা, সুখী জীবনের প্রলোভন বড় হতে পারে তা ব্রতীরা বোঝে নি। বোঝে নি, প্রথম থেকেই বহুজন ওদের ফাঁস করে দেব বলেই দলে ঢোকে। ব্রতীর বয়স কম ছিল। একটা বিশ্বাস ওকে, ওদের অন্ধ করে দিয়েছিল। ওরা বোঝে নি যে-ব্যবস্থার সঙ্গে ওদের যুদ্ধ, সে-ব্যবস্থা জন্মের আগেই বহুজনকে ভ্রূণেই বিষাক্ত করে দেয়। সব তরুণ আদর্শ-দীক্ষিত নয়, সবাই মৃত্যুকে ভয় করে না, এমন নয়, এ কথা ব্রতীরা জানত না। তাই ব্রতী ভেবেছিল খবর গেছে, সমুরা সতর্ক হবে, টেলিফোনেও জানাবে সব ঠিক আছে।

যখন সারাদিন গেল, সন্ধ্যা হল, শীতের সন্ধ্যা কলকাতায় তাড়াতাড়ি আসে তখন বোধহয় ব্রতী ভেবেছিল খবর আসবার হলে এসে যেত এতক্ষণ। দুপুর অব্দি যখন ফোন এল না তখন ওর মনে উদ্বেগ হয়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, সন্ধ্যা এল। সুজাতা ফিরে এলেন।

কিরে আজ বেরোসনি?

না।

কেন?

কেন আর, এমনি। চল না, চা খাবে চল না।

একসঙ্গে চা খেলেন সুজাতা, ব্রতী বসেছিল দরজার দিকে পেছন ফিরে। ওর গায়ে ছিল একটা পুরোনো শাল। অনেকদিনের শাল। নীলচে রঙ, আগাগোড়া ফুটো ফুটো। ব্রতী শীতের মেয়ে ওটা গায়ে জড়িয়ে থাকত বাড়িতে। সুজাতাও বলতেন, ওটা ছাড় না বাপু, আরেকটা গায়ে দে।

ব্রতী বলত, বেশ ওম হয়, হেম বলে।

সেই শালটা গায়ে; চুলটা আঁচড়ানো নেই, ব্রতীর পেছনে দরজা

খোলা। দরজা দিয়ে দেখা যায় উঠোনের ওপারে পাঁচিল, বাসন মাজার কলতলা।

চা খাওয়ার সময়ে ব্রতী অনেকদিন পর বিনির সঙ্গে খুনসুটি করেছিল। ব্রতী কয়েকদিন আগে বন্ধুদের সঙ্গে দীঘা গিয়েছিল। পরে সুজাতা জেনেছেন ও দীঘা যায় নি। জেনেছেন, খড়্গপুর স্টেশনেই পুলিশ গিজগিজ করছিল। দীঘার পথে বাস থামিয়ে থামিয়ে হেলমেট পরা এম. পি. উঠছিল। টর্চ ফেলে মুখ দেখছিল যাত্রীদের। কোন কোন গ্রামের সামনে বাস স্লো-মোশানে যেতে বাধ্য হয়। দুধারে, পথের দুধারে অন্ধকারে বেয়নেট উঁচিয়ে পাহারাদার দাঁড়িয়েছিল। ব্রতী দীঘা যায় নি।

সুজাতা তখন তো জানেন না। বিনিও জানে না। বিনি ওকে দীঘার কথা জিগ্যেস করছিল।

ব্রতী বলল, দীঘা একটা বাজে জায়গা। যেমন থাকার অসুবিধে তেমনি খাওয়ার।

আহা আমার মাসতুতবোন গিয়েছিল। সে ত সে কথা বলল না? তোমার বোন ত।

আর তোমার বুঝি অচেনা? তোমার প্রাণের বন্ধু দীপকের সঙ্গে ও টেনিস খেলে জান না? খুব ত আড্ডা মারতে যাও দীপকের বাড়ি?

আমি কি চিনি তোমার বোনকে?

সুজাতা বললেন, নাই বা চিনলি। গেছলি যখন তাকিয়েও দেখেছিস।

কেন?

খুব সুন্দর সে।

কি যে বল? তোমার চেয়ে সুন্দর?

বিনি অমনি বলল, মা, ব্রতী কিন্তু তোমায় তেল দিচ্ছে। নিশ্চয় ওর কোন মতলব আছে।

কি যে বল বিনি? ওর কি এখন সিনেমার টাকা দরকার হয়,

না হাতখরচ ? মাকে খুশি করবার কোন দরকার নেই ওর। মাকেই দরকার নেই।

এটা কি বললে মা ?

বিনি বলল, তুমি আচ্ছা বোকা মা ! আমি হলে ও যেমন ন্যাশনাল স্কলারশিপের টাকাগুলো পেত অমনি বাগিয়ে নিতাম।

অত সোজা নয় বৌদি, দাদাকে জিগ্যেস করে দেখ।

কেন, দাদাকে জিগ্যেস করব কেন ?

দাদাটা হাঁদা ছিল। খরচ করে ফেলত হাত খরচের টাকা। আমার পইতের টাকা থেকে ওকে ধার দিতাম। কিন্তু টাকায় টাকা সুদ আদায় করতাম।

সুজাতার কেন মনে হয়েছিল ব্রতী ওঁকে এড়িয়ে গেল ? উনি বলেছিলেন, মাকে তোর দরকার হয় নাকি ? জানতে চাস কখনো মার কথা ? দিন নেই, রাত নেই, শুধু বেরিয়ে যাস। বলিস কাজ আছে।

কাজ থাকে যে।

বাবা রে বাবা ! এখনই এত কাজ ? তোমার দাদার মত যখন সিরিয়াস কাজ করবে তখন কি হবে ?

ব্রতী বলেছিল, আমি সিরিয়াস কাজ করি না তোমায় কে বলল ?

সিরিয়াস কাজ মানে ত আড্ডা মারা।

আড্ডা মারা একটা সিরিয়াস কাজ নয় ?

জানি মশাই জানি। আরো একটা জানি।

কি জান ?

নন্দিনীর সঙ্গে আড্ডা মারা সবচেয়ে সিরিয়াস কাজ।

নন্দিনীর সঙ্গে আড্ডা মারি তোমায় কে বলল ?

বলবে আবার কে মশাই ? আমি বুঝি নন্দিনীর ফোন ধরি না মাঝে মধ্যে ?

ব্রতী হেসেছিল। নিঃশব্দে হাসত ও। চোখ হাসত মুখ জ্বলজ্বল করত ওর। হেসেই ও চিরদিন উত্তর দেবার দায় এড়িয়ে যেত।

চল মা, লুডো খেলি ওপরে।

বিনি আবার বলেছিল, মা, ব্রতীর নিশ্চয় কোন মতলব আছে আজ।

তুমিও চল।

না বাবা। তুলির সঙ্গে কোথায় যেতে হবে। না গেলে মেজাজ করবে।

ইচ্ছে না করলে যাও কেন?

ব্রতী মৃদু গলায় বলেছিল।

সুজাতা আর ব্রতী ওপরে লুডো খেলছিলেন। লুডো খেলতে খেলতে সুজাতা বলেছিলেন, ব্রতী, নন্দিনা কে রে?

একটি মেয়ে।

আমাকে একদিন দেখাবি?

দেখতে চাইলে দেখাব।

দেখতেই ত চাইছি।

দেখলে চোটে যাবে।

কেন?

খুব সাধারণ দেখতে।

তাতে কি?

বসের ভাল লাগবে না।

বাবাকে ব্রতী 'বস্' বলত আড়ালে। ওর জ্ঞান হওয়া থেকে বাবার মুখে 'আমি এ বাড়ির বস্। আমি যা বলব তাই হবে এ বাড়ীতে' কথাটা ব্রতী কয়েক লক্ষবার শুনেছে।

না লাগল।

মা, তুমি কি জান বস্ পাঁচটার পর কোথায় যায়? রোজ রোজ?

হঠাৎ সুজাতার সন্দেহ হয়েছিল, ব্রতী দিব্যনাথের সঙ্গে টাইপিস্ট মেয়েটির মেলামেশার কথা জানে।

এ কথা কেন হঠাৎ, ব্রতী?

এমনি। জান?

ওকেথা থাক ব্রতী।

ব্রতী কিছুক্ষণ মন দিয়ে খেলেছিল। তারপর বলেছিল মা আমার জন্যে কি তোমার মনে খুব কষ্ট?

কিসের কষ্ট ব্রতী?

বল না?

কোন কষ্ট নেই ব্রতী।

মাঝে মাঝে মনে হয় হয়ত আছে। দাদাকে নিয়ে, দিদি ছোড়দিকে নিয়ে ত তোমার কোন কষ্ট নেই।

সুজাতা কথা বলেন নি। মিথ্যে বা মন রাখা কথা সুজাতা কখনো বলতে পারেন নি।

কই, কিছু বললে না ত?

কষ্টে থাকা কাকে বলে ব্রতী?

কষ্টে থাকলে তাকে বলে কষ্টে থাকা।

সবাই কি আমার মনের মত হবে? ওরা ওদের মত হয়েছে। ওরা সুখী থাকলে আমি খুশি।

ওরা কি সুখী?

তাই ত বলে।

আশ্চর্য!

কি আশ্চর্য?

তুমি এত প্যাসিভ কেন মা?

না হয়ে উপায় কি বল? ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে আমাকে প্যাসিভ করেই রাখা হয়েছিল যে। তোর বাবা···তোর ঠাকুমা···

দিবানাথ সুজাতাকে প্রথম তিন ছেলেমেয়ের ব্যাপারে সাধারণতম অধিকারও খাটাতে দেননি সব। তাঁর মার হাতে ছিল। স্ত্রীকে পদানত না করেও মাকেও সম্মান দেওয়া যায় তা দিবানাথ জানতেন না। স্ত্রীকে পদানত রাখবেন, মাকে রাখবেন মাথায়, এই ছিল তাঁর নীতি।

সুজাতার আত্মসম্মান ও অভিমান ছিল খুব বেশী। বিয়ের পরেই তিনি বুঝেছিলেন, এ সংসারে তিনি নিজেকে যত নেপথ্যে রাখবেন, তাতেই অন্যের সুখ। এই 'অন্য' বলতে তিনি দিব্যনাথ ও শাশুড়িকে বুঝতেন। জ্যোতি, তুলি, নীপা, তিনজনেই মাকে দেখেছিল অত্যন্ত গৌণ ভূমিকায়। তারাও ওঁকে উপেক্ষা করে বড় হয়েছে। তাই ওরাও সুজাতার মনে একদিন 'অন্য' দলে চলে যায়।

অবশ্যই দিব্যনাথ সুজাতার মনের এইসব অতল ব্যথার খোঁজ রাখতেন না। স্ত্রীর প্রতি তিনি বিশেষ আসক্ত বা বিশেষ উদাসীন, কোনোটাই ছিলেন না। স্ত্রী স্বামীকে স্বাভাবিক নিয়মে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, মানে। স্বামীকে স্ত্রীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আনুগত্য পাবার জন্যে কোন চেষ্টা করতে হয় না। দিব্যনাথ মনে করতেন বাড়ি করেছেন, চাকরবাকর রেখেছেন, যথেষ্ট কর্তব্য করেছেন। বাইরে মেয়েদের নিয়ে ঢলাঢলি করবার কথা গোপন করতেও চেষ্টা করতেন না দিব্যনাথ। তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর সব অধিকারই আছে।

তা বলে তিনি অবিবেচক নন। তাঁর ফার্মে মোটা টাকা আসতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুজাতাকে কাজ ছেড়ে দিতে বলেন।

সুজাতা কাজ ছাড়েন নি। ওটা তাঁর দ্বিতীয় বিদ্রোহ।

দিব্যনাথ জানতেন তাঁর ছেলেমেয়েরা বাবার চরিত্রদৌর্বল্যের কথা জানে। তাতেও তিনি লজ্জিত হতেন না। কেননা তাঁর প্রথম তিন ছেলেমেয়ে তাঁকে মানে, তাঁর সব আচরণকে পুরুষ-জনোচিত মনে করে, তা তিনি জানতেন।

তিনি জ্যোতিকে বলেছিলেন,

তোমার মা এ বিট পাজ্‌লিং। কাজ ছাড়বেন না কেন? উনি ত, যাকে বলে ইচিং ফর ইনডিপেনডেন্‌স, সে টাইপের ওম্যান নন। ফ্যাশন করে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের মতও নন। তবে উনি কাজ ছাড়বেন না কেন? আশ্চর্য!

তুমি মাকে বলেছ?

বললাম, এখন ত আর দরকার নেই। এখন কাজ ছাড়। সংসার দেখ-টেখ। মাও ত মারা গেছেন ? বললেন, যখন ছেলেমেয়ে ছোট ছিল সংসার দেখলে ভাল হত, তখনও আমার কোন কাজ ছিল না। আমাকে কোন দায়িত্ব নিতে দেওয়া হয়নি। এখন তোমার ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেছে। সংসার নিয়মেই চলে। এখন আমার প্রয়োজন এখানে আরো কম।

সুজাতাকে দিব্যনাথ বুঝতে পারেন নি। সুজাতা যাকে বলে উগ্র স্বাধীনচেতা মহিলা, তা নন। আবার ফ্যাশনেবল চাকরি করে যে সব ফ্যাশনেবল মহিলারা গাড়ি চালিয়ে কলকাতা চষে ফেলেন, সুজাতা তাও নন।

সুজাতা শান্ত, স্বল্পভাষী, পোষাকে-আশাকে সেকেলে। বাড়ির গাড়ি পারতপক্ষে চড়েন। ট্রামে চড়ে ব্যাঙ্কে যান, ট্রামে ফেরেন। বাড়ি থেকে বেরোন না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেন না। বাড়ি ফিরে একটু বই পড়েন, টবের গাছে জল দেন, ছোট ছেলেকে পেলে একটু গল্প করেন।

কাজ-না ছাড়া সুজাতার দ্বিতীয় বিদ্রোহ। প্রথম বিদ্রোহটা সুজাতা ব্রতীর দুবছর বয়সে করেন। দিব্যনাথ কিছুতেই ওঁকে পঞ্চমবার 'মা' হতে বাধ্য করতে পারেন নি।

দিব্যনাথ বেজায় খেপে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বিয়ে করলে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই একটা ডিউটি থাকে। তোমার আপত্তিটা কোথায় ?

সুজাতা রাজী হন নি।

তুমি আমাকে ডিনাই করছ।

তুমি তোমার ফুলফিলমেণ্টের জন্যে একা আমার ওপর কোনদিনই নির্ভর কর নি।

কি বলতে চাও ?

যা বলছি তা তুমি জান, আমিও জানি।

দিব্যনাথ আগে, সুজাতা যখন পরপর মা হয়ে চলেছিলেন, তখনো নিয়মিত অন্য মেয়েদের সাহচর্য করতেন। এরপর থেকে তা আরো বাড়িয়ে দেন। কিন্তু সেটা যদি ফাঁদ হয়, সুজাতা সে ফাঁদে ধরা দেন নি।

কিন্তু ব্রতীর মৃত্যুর আগের দিন সুজাতা ব্রতীর সঙ্গে কথা বলতে এসব কথা বলেন নি। এখন মনে হয় জানত, সবই জানত ব্রতী, সবই বুঝত। সেজন্য মার ওপর ওর সব সময়ে চোখ থাকত। সুজাতার অসুখ হলে দশ বছর বয়সেও ব্রতী খেলা ছেড়ে চলে আসত। বলত, তোমার মাথায় বাতাস করব?

দিব্যনাথ বলতেন মিলক্‌সপ্‌। মেয়েমার্কা ছেলে। নো ম্যানলিনেস।

ব্রতীই প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছে ব্রতী কি দিয়ে গড়া ছিল, কত শক্তি আর সাহস দিয়ে।

সেদিন ব্রতী ওঁর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বসেছিল। তারপর বলেছিল, খেলা থাক। এস না, গল্প করি আজ?

দাঁড়া, কি রাঁধবে বলে আসি।

ছোড়দি নেই?

না। তুলি টোনির একজিবিশ্যন নিয়ে ব্যস্ত। একবার শুধু এসে বিনিকে নিয়ে যাবে।

তাও ত বটে!

কাল কি খাবি, বল?

হঠাৎ?

কাল তোর জন্মদিন না?

বাব্বা, জন্মদিন তোমার মনে থাকে?

থাকে না?

আমার ত থাকে না।

আমার ভুল হয় কখনো?

কাল নিশ্চয়ই তুমি পায়েস করবে?

এখন ত শুধু একটু পায়েস করি।

দাঁড়াও, কি খাওয়া যায় ভাবি।

মাংস খেতে চাস না যেন।

কেন, বস্ বাড়িতে খাচ্ছে ?

হ্যাঁ।

কর না যা হয় একটা।

সুজাতা নিচে যাচ্ছেন, এমন সময় ফোন বাজল। ব্রতী ফোন ধরেছে দেখে উনি নিচে গেলেন।

উনি উপরে এলেন। দেখলেন। ব্রতী নীল শার্ট আর প্যান্ট পরে চুল আঁচড়াচ্ছে।

কি হল ?

একটু বেরোতে হচ্ছে, গোটা কয়েক টাকা দাও ত।

কোথায় বেরোচ্ছিস ?

একটু কাজে। টাকা দাও।

এই নে। কখন ফিরবি ?

ফিরব···ফিরব···দাঁড়াও।

ব্রতী দেখে নিল প্যান্টের পকেটে কি কি আছে। একটা কাগজ ছিঁড়ে ফেলল কুচিয়ে।

কোনদিকে যাচ্ছিস ?

কোন বিশেষ আশঙ্কা না করেই সুজাতা এই স্বাভাবিক প্রশ্নটা করেছিলেন। কেননা, কলকাতায় তখন একটা অন্য অবস্থা চলছে। বুড়োরা-প্রৌঢ়রা-চল্লিশ পেরুনো লোকেরা যে কোন জায়গায় যেতে পারে। কিন্তু তরুণদের কাছে তখন কলকাতার অনেক জায়গাই নিষিদ্ধ অঞ্চল।

তখন সেই আড়াইবছরে কি হত না হত কলকাতার পুরনো কাগজ ঘাঁটতে গিয়ে দেখে কি সুজাতা কম অবাক হন এই ক'দিন আগে ?

সে সময় তাঁর মনে হত, কেবলি মনে হত, সব যেন উল্টো-পাল্টা। ব্রতী যখন জীবিত, ব্রতীও যে চরম দণ্ডে দণ্ডিতদের দলে।

তা যখন জানেন না সুজাতা, তখনো রোজ কাগজে এক একটা ঘটনার কথা পড়তেন আর শিউরে উঠতেন।

সে সময় আবার তাঁর বাড়িতে কেউ কাগজের ভাঁজই খুলত না। বলত কাগজ খুললেই দেখা যাবে কতজন মরেছে, কি ভাবে মরেছে, তার বীভৎস সব বর্ণনা!

দেখলেই সকলের খারাপ লাগত তাই সুজাতা আর ব্রতী ছাড়া কেউ কাগজ পড়ত না।

কাগজ দেখতেন সুজাতা, ব্যাঙ্কে বেরোতেন। কেন মনে হত কলকাতা একটা রং সিটি? মনে হত সেই ময়দান—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-মেট্রো-গান্ধীর মূর্তি-মনুমেণ্ট, সব আছে, তবু এটা কলকাতা নয়? এ কলকাতাকে তিনি চেনেন না জানেন না।

কাগজ খুলে পরে দেখেছিলেন, যে ভোরে তাঁর ঘরে টেলিফোন বাজে, সেদিনও হাপুর বাজারে সোনার দর চড়েছিল, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বহন করে ভারতীয় হাতির বাচ্চা দমদম থেকে টোকিওতে উড়ে গিয়েছিল, কলকাতায় বিদেশি ছবির উৎসব হয়েছিল, সচেতন শহর কলকাতা সচেতন ও সংগ্রামী শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা ভিয়েৎনামে বর্বরতার প্রতিবাদে আমেরিকান কনসুলেটের সামনে রেড রোডে, সুরেন ব্যানার্জি রোডের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেছিলেন।

সব কিছু ঘটেছিল। কলকাতায় তাপমান যন্ত্রে যা যা স্বাভাবিক সব। যে জন্যে কলকাতা ভারতের সবচেয়ে সচেতন শহর।

এতেই ত বোঝা যাচ্ছে কলকাতা সেদিনও স্বাভাবিক ছিল। শুধু ব্রতী ভবানীপুর থেকে দক্ষিণ-যাদবপুর যেতে পারছিল না, বারাসত থেকে আটটি ছেলে প্রথমে ফাঁস বাঁধা হয়ে জ্ঞান হারিয়ে, তারপর গুলি খেয়ে লাশ না হয়ে বেরোতে পারছিল না। পূর্ব-কলকাতায় পাড়ার আবাল্য চেনা ছেলের রক্তাক্ত মৃতদেহ রিক্‌শায় বসিয়ে, তাশা ও ড্রাম বাজিয়ে, যুবকেরা কি যেন পুজোর বিসর্জন মিছিলে প্রতিমার আগে আগে নেচে নেচে যাচ্ছিল।

কলকাতায় সচেতন ও সংগ্রামী নাগরিকদের কাছে সেটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি।

কলকাতায় লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা ঠিক তার একবছর তিন-মাস বাদে বাংলাদেশের সহায় ও সমর্থনকল্পে পশ্চিমবঙ্গ তোলপাড় করে ফেলেছিল। নিশ্চয় তারাই ঠিকপথে চিন্তা করেছিল, সুজাতার মত মায়েরা ভুল পথে চিন্তা করেছিলেন? পশ্চিমবঙ্গের তরুণরা শহরে এ পাড়া থেকে ও পাড়া যেতে পারে না এতে তাদের সংগ্রামী বিবেক এতটুকু পীড়িত হয় নি যখন, তখন নিশ্চয় তারাই যথার্থ?

পশ্চিমবঙ্গের তরুণদের জীবন বিপন্ন, এটা নিশ্চয় কোন গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা নয়? যদি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হত, তাহলে কি মিছিল শহর কলকাতার সংগ্রামী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা তা নিয়ে কলম ধরতেন না?

সমুর শরীরে তেইশটা আঘাত ছিল, বিজিতের শরীরে ষোলটা। লালটুর নাড়ির পাক খুলে লালটুকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে কোন পৈশাচিকতা নেই।

যদি থাকত, তা হলে ত কলকাতার কবি ও লেখক ওপারের পৈশাচিকতার সঙ্গে এপারের পৈশাচিকতার কথাও বলতেন। যখন তা বলেন নি, যখন কলকাতার প্রত্যহের রক্তোৎসবকে উপেক্ষা করে কবি ও লেখক শুধু ওপারের মরণ যজ্ঞের কথাই বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীই নির্ভুল? সুজাতার দৃষ্টিভঙ্গী নিশ্চয় ভুল? নিশ্চয়। কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবী-শিল্পী এঁরা ত সমাজের সম্মানিত সভ্য, স্বীকৃতি পাওয়া মুখপাত্র, দেশের প্রতিভূ।

সুজাতা কে? তিনি ত শুধু মা। যাদের হাজার হাজার হৃদয়ে এই প্রশ্ন আজও কুরে কুরে খাচ্ছে, তারা কে? তারা শুধু মা!

ব্রতী যখন নীল শার্ট পরে অভ্যাসমত হাত দিয়ে দুদিকের চুল সমান করে নিয়ে বেরিয়ে যায়, সুজাতা জিগ্যেস করেছিলেন, কোথায় যাচ্ছিস?

ব্রতী এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর হেসে বলেছিল, আলিপুরে দেরি হলে জেন, রণুদের বাড়ি থেকে গেছি। চিন্তা কর না।

ব্রতী তখনি জানে ভয়ংকর বিপদ ঘটে গেছে। যাকে খবর দিতে বলা হয়েছিল সে সমুদের খবর দেয় নি। কোন খবর না পেয়ে পূর্বপরিকল্পনা মত সমুরা পাড়ায় ফিরে গেছে।

ব্রতী তখনো জানে না ছেলেটি সমুদের খবর দেয় নি কিন্তু পাড়ায় খবর দিয়েছে সমুরা আসবে।

তাই ব্রতী ভেবেছিল রাতেভিতে যদি সমুদের সাবধান করে দিয়ে পাড়া থেকে বের করে আনতে পারে। পারবে বলে বিশেষ আশা করেনি, ভেবেছিল পারলেও পারতে পারে।

অথচ এমন স্বাভাবিক গলায় এমন সহজে ও বলেছিল, চিন্তা কর না—যে সুজাতা নিশ্চিন্ত না হয়ে পারেন নি।

খুব নিরাপদ রণুর বাড়ি যাওয়া।

খুব নিরাপদ মিলি মিত্তির, যিশু মিত্তিরের ছেলে রণুর বাড়ি। রণু আর ব্রতী এক কলেজের ছেলে নয়, একসঙ্গে এক স্কুলে পড়েছে। রণু ওদের সমাজের বিদ্রোহী বলে পরিচিত। রণু ছাত্রজীবনেই পপ গানের দল দিয়ে কাব্যারেতে গায়, বিদ্রোহী রণু সমাজকে বিশ্বাস করে না বলে সায়েবদের সঙ্গে মারিহুয়ানা খায়, কিন্তু রণু নিরাপদ।

রণুর সঙ্গে রাত কাটালে ব্রতীর কোন বিপদ নেই। সুজাতা বলেছিলেন, হেমকে বলিস দরজা বন্ধ করে দেবে। বলিস কিন্তু।

বলব।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে ব্রতী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে সুজাতা মুখ তোলেন। উনিও বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিলেন। দেখলেন ব্রতী তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। খুব গভীর অভিনিবেশে ওঁর মুখ দেখছে।

মার মন, মার মন, এসব বাজে কথা। কই, কোন আশঙ্কা ত

হয়নি সুজাতার মনের মার মন আগে থেকে বিপদ জানতে পারে তাই যদি সত্য হবে, তবে ত সুজাতার মনে তখনি বিপদের আশঙ্কা হত। হয়নি, কিছুই হয়নি।

পরে সুজাতা জেনেছিলেন দেড়বছর হল রণুর সঙ্গে ব্রতীর কোন যোগাযোগ নেই। এমন কোন বন্ধুও নেই, যার সঙ্গে ব্রতীরও দেখা হয়, রণুরও দেখা হয়। ব্রতী ওঁকে সত্যি কথা বলে নি।

ঘুমোলে সুজাতার শরীর সুষুপ্ত থাকে, চেতনা জেগে থাকে, প্রখর হয়। স্বপ্নে কত সময়ে সুজাতা সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকেন, ব্রতী নিচে। স্বপ্নে সুজাতা জানেন ব্রতী রণুর বাড়ি যাবে না, সমুদের বাঁচাতে যাবে। তাই আকুল হয়ে সুজাতা ছুটে যেতে চান, হাত ধরে টেনে আনতে চান ব্রতীকে। ফিরে আয় ব্রতী, বলতে চান।

বলতে পারেন না সুজাতা। স্বপ্নে ওঁর পা পাথর হয়ে জমে থাকে, ব্রতী ওঁর মুখ দেখতে থাকে, অপেক্ষা করতে থাকে, তারপর যখন ব্রতীর গলায় পেটে আর বুকে নীল শার্টের ওপর তিনটে গোল দাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, মুখের চেহারা পালটে যেতে থাকে মাথার পেছন থেকে ঘাড় বরাবর ছুরির দাগ ফুটে ওঠে, তখন সুজাতার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম যখনি ভাঙে তখনি সেই মায়া প্রহেলিকা অদ্ভুত বিভ্রম যেন এতক্ষণ ব্রতী ছিল এখনি বেরিয়ে গেল।

না, ব্রতী চলে যাবার সময়ে তাঁর মনে কোন আশঙ্কা হয় নি, সে-রাতেও তিনি দিব্যনাথকে হজমের ওষুধ দেন। সুমন কেঁদে উঠতে বাইরে এনে ভোলান। হেমকে মনে করিয়ে দেন, কাল ব্রতীর জন্ম-দিন। এক লিটার দুধ কিনে আনতে ভুল না হেম। পায়েস হবে।

খুব স্বাভাবিক, দৈনন্দিন ঘটনা সব।

সুজাতা কি জানতেন, রাত বারোটা না বাজতেই সমুদের বাড়ির সামনে ভিড় জমে গিয়েছিল? পাড়ার প্রবীণ প্রবীণ ভদ্র-লোকেরা চিৎকার করে বলেছিলেন, বের করে দিন ওদের?

সমুর মার কাছে যখন প্রথমবার গিয়ে দাঁড়ান সুজাতা, সমুদের

ধরে বসেন, তখন ওর মনে হয় এটা একটা স্বাভাবিক পরিবার, এ পরিবারের লোকজনের মানসিক প্রতিক্রিয়াও স্বাভাবিক।

সুজাতা বোঝেন, তাঁর লেখাপড়া, স্বচ্ছচিন্তা, চিন্তাকে বোধ্য-বাণীতে প্রকাশ করার ক্ষমতা আছে বলে তিনি যেসব কথা চিন্তা করেন, সমুর মা স্বল্প লেখাপড়া, সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি, চিন্তাকে বোধ্যবাণীতে প্রকাশ ক্ষমতার একান্ত অভাব নিয়ে ঠিক এক কথাই চিন্তা করেন।

তাঁর যা মনে হয়েছিল, সমুর মা সেই কথা বলে কেঁদে ওঠেন, মাইরা ক্যান ফালাইল দিদি? তাগারো যদি এট্টা অঙ্গ খুতা কইরাও জীয়াইয়া থুইত। তবু ত জানতাম সমু আমার বাইচা আছে। আর নয় নাই দ্যাখতাম চক্ষে। নয় জেলেই থুইত? তবু ত জানতাম অ আমার বাইচা আছে! আমি কুন অপরাধ করছিলাম কন?

সমুর দিদি বলেছিল, কাইন্দনা মা গো। হেয় ত আর ফিরব না। হেয় ত তোমার বুকে লাথি মাইরা চইলা গেছে। মা গো! আমাগো মুখে চাইয়া বুক বান্ধ।

মনেরে ত বলি কাইন্দা ফল নাই। মন বুঝে না।

কাইন্দা জীবন ক্ষয় কইরা কি অইব মা?

তরা ঠিকোই কইস। আমি দিদি যে আবাগী জন্মদুঃখী। আমার দুঃখে শিয়ালকুকুর কান্দে। কবে বা বিয়া দিছিল বাপে। হেয় লিখিপরি তেমুন শিখে নাই। বারির বরো। তারেই সংসার দেখতে অইত। দেশে নি তবু ধানজমি আছিল। এখানে ত কিছুই আছিল না দিদি? তেমন মানুষ নয় যে ধাউরামি ধান্দা কইরা কপাল ফিরাইব! এহানেও যে দুঃখ হেই দুঃখ আছিল?

সুজাতা সমুর মার প্রত্যেকটি কথা বুঝতে পারছিলেন।

এহানে মাইয়াপুলা হকলটিরে লিখিপরি শিকায়। আইজকাল ত লিখিপরি ছারা চলে না দিদি! তা সমুর লিগ্যা হেয়ার কুন-অ খরচ লাগে নাই। বছর বছর বৃত্তি পাইছে। বৃত্তি পাইছিল বইলাই ত ওই কলেজে গিয়া ভর্তি হইল। কারা তারে অমন পথে নিল, কারা

বা তারে মরতে শিখাইল ; কত বলছি অ সমু ! কি বা করস ? যাইস কোথা বাইর হইয়া ? পোলায় বলত, মা ডরাও ক্যান ? আমি মন্দ কাজ করি না। তখন বুঝি নাই।

সমুর দিদি জিগ্যেস করেছিল, মাসিমা চা খাইবেন ?

দাও একটু।

সমুর মা বলেছিলেন, ওই মাইয়া কলেজ ছাইরা শুধু ছাত্র পরায় আর টাইপ শিখে। পরেরডারে তার মাসি লইয়া গিছে। তবু ত আর দুটা আছে ? ছাত্র পরাইয়া চাইরডা প্যাট পুরান্ কি সোজা দিদি ?

সমুর দিদি চা এনেছিল। এ রকম পেয়ালায় সুজাতা কখনো চা খান নি।

হকলই অদৃষ্ট। নয় ত পোলা জুয়ান আইল। পরা হ্যায় কইরা চাকরি করব, বাপমায়েরে ভাত দিব, দিদির বিয়া অইবে, তা আমার মাইয়ার কপালে নি সিন্দুর উঠব কুন-অ-দিন ?

ও রকম ভাববেন না। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে নিশ্চয়। একদিন ওর বিয়ে হয়ে যাবে।

কথাটা সুজাতা আন্তরিকভাবেই বলেছিলেন। অথচ কথাটাকে সমুর মা অন্যভাবে নিয়ে জ্বলে উঠতে পারতেন। জ্বলে উঠলে দোষ দেওয়া যেত না। অভিভাবক নেই, পয়সা নেই, সাহায্য করবার মানুষ নেই, সমুর মা মেয়ের বিয়ে দেবেন একদিন, এ কথা বললে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া হয়।

সমুর মা জ্বলে উঠেন নি। সুজাতার হাত ধরে বলেছিলেন, হেই কথাই কয়েন দিদি।

তারপর, কি ভেবে বলিছিলেন, ক্যান বা আইছিল তারা ? চারোজন ত পারার বাইরেই আছিল। ক্যান বা আইছিল মরতে। ক্যান বা আপনার পোলা হেই হকলডিরে সাবধান করতে আইল ? আপনার ত আরেক পোলা আছে। হেয়ারে বুকে লইয়া তার দুঃখ

ভোলবেন। আমার ওই একো পোলা! ছুডকালে টাইফাটে মইরা যায় সমু। কি কইরা বাচাইছিলাম অরে! হে কি এই অইব বইলা?

ব্রতীরও ক্লাস টেনে থাকতে জণ্ডিস হয়। ভুগে ভুগে ব্রতী কি রোগা, কি হলদে হয়ে গিয়েছিল। ওজনে মেপে মশলা ছাড়া রান্না করে দিতে হত ব্রতীকে। ও যা খেত না, সুজাতাও তা খেতেন না তখন মুরগীর মাংস ছাড়া অন্য মাংস খাওয়া নিষেধ ছিল ব্রতীর। সেই সময়ে সুজাতা যে মাংস খাওয়া ছেড়ে দেন আর খান নি কোনদিন।

অন্য ছেলে কটি কি কাছেই থাকত?

হকলডির বারিই এ পারা ও পারা। তা বিজিতের মারে অর দাদা লইয়া গিছে কানপুর। পার্থ'র মা থাইকাও নাই। রুগাভুগা মানুষ, হেয় কি এই চোট সামলাইতে পারে? হেয় বিস্‌না লইছে। এট্টা পোলা যমরে দিল, ছুডটা দেশান্তরী। হে ফিরলে নাকি কাইট্টা ফালাইব।

পার্থ'র ওই একটি ভাই?

হ দিদি! পার্থ'র মায়ে উঠে না, খাই না, লয় না, খালি কয় আমার পোলা দুডারে আইনা দে। য্যান পাগল পাগল অইছে দিদি? মাইয়া মানুষের প্রাণ কাছিমের জান, মরলে মাগী বাচে অহন।

আরেকটি ছেলে ছিল?

লালটু? লালটু মায়েরে জ্বালাইয়া যাই নাই। হেয় মায়ের আগেই মরছিল। লালটু জন্ম অবাইগা। বাপ গিয়া বুরা বয়সে বিয়া বসল। খ্যাপা-ক্ষ্যাপ্ত অইয়া লালটু আইল বুনের বারি। তার নাগাল পোলা এ তল্লাটে আছিল না। পরায় য্যামন ভাল, শরীলে তেমনি জয়ান, কলোনির হকল ভাল কাজে হে আগে ঝাঁপ দিয়া পরত।

কাছেই থাকত?

দুখান পল্লী বাদে। লালটু-পার্থ'-বিজিত-সমু হকলডি ছিল একোরকম। অরা থাকতে পারায় কুন-অ মন্দ কাজ কইরা মন্দ কথা কইয়া কেউ পার পায় নাই। লালটুই ত হকল পোলাডিরে খ্যাপাইয়া লাচাইয়া ওই পথে নিছিল দিদি? তা অবাইগা নিজেও গেল গিয়া।

সুজাতার মনে হয়েছিল লাশঘরে তিনি কয়েকটি শব দেখে-ছিলেন, শ্মশানে দেখেছিলেন কয়েকটি মানুষের মাথা কোটাকুটি, কান্না শুনেছিলেন।

তখন ওই শবদেহ, ওই শোকার্ত নরনারী, ওদের সঙ্গে তিনি কোথায়, কোন আঙ্কিক নিয়মে এক, তা বোঝেন নি। এখন বুঝতে পারলেন, মৃত্যুতেই ব্রতী ওদের সঙ্গে এক হয়ে শুয়েছিল না, জীবনেও ব্রতী ওদের সঙ্গে এক ছিল।

ব্রতীর জীবনের যে অধ্যায়টুকু ওর নিজের তৈরি করা, সেখানে ও সম্পূর্ণতম, সে অধ্যায়ে এই ছেলেগুলি ওর নিকটজন। তাঁর নয়। আমার ছেলে, আমার ভাই, এগুলো ব্রতীর জন্ম থেকে নির্দিষ্ট কতকগুলো সংজ্ঞা।

কিন্তু নিজের মত, নিজের বিশ্বাস, নিজের আদর্শ নিয়ে ব্রতী যে নিজস্ব পরিচয় তৈরি করেছিল, যে ব্রতীকে সৃষ্টি করেছিল, সে ব্রতী মাকে যতই ভালবাসুক, মা তাকে যতই ভালবাসুন, তাকে চিনতেন না। এই ছেলেরা সুজাতার অচেনা যে ব্রতী, তাকেই চিনত।

তাই ওরা এবং ব্রতী জীবনে একাত্ম ছিল, মৃত্যুতেও সুজাতা তাই তাদের সঙ্গেই একাত্ম, যারা এই ছেলেগুলির শোক হৃদয়ে বহন করছে।

ব্রতীর মৃত্যুর পর একটি বছর, যতদিন না সুজাতা সমুদের বাড়ি আসেন ততদিন তিনি নিজের শোকের মধ্যে নিজে যেন বন্দী হয়েছিলেন।

সমুর মার অকুণ্ঠ বুকফাটা বিলাপ শুনে, ছেলেগুলির কথা শুনে, তবে সুজাতা বুঝলেন ব্রতী তাঁকে, তাঁর নিঃসঙ্গ শোকের একাকিত্বে রেখে চলে যায় নি। তাঁর মতো আরো বহুজনের সঙ্গে তাঁকে এক করে, আত্মীয় পাতিয়ে দিয়ে গেছে।

কিন্তু কেমন করে সুজাতা সেই বহুজনের মধ্যে দিয়ে মুক্তি পাবেন? তিনি যে ধনী, অভিজাত, অন্যশ্রেণীর মানুষ? এরা তাঁকে গ্রহণ করবে কেন?

সমুর মা বলেছিলেন, লালটু কাজ কাজ কইরা পাগল হইয়া বেরাইছে। এট্টা কাজও পায় নাই। খ্যাপা-ক্ষ্যাপ্ত হইয়া থাকত, হেই অইতে অর মনে এত জ্বালা উঠত।

এবারও সমুর মা কাঁদছিলেন। সুজাতা ওঁর হাতে হাত বোলাচ্ছিলেন।

এক বছরে সমুদের ঘরটা আরো জীর্ণ, ঘরে দারিদ্রের চিহ্ন আরো প্রকট, সমুর মা বোধহয় এমন কাপড় পরেছিলেন যা পরে সুজাতার সামনে আসা যায় না। সুজাতা আসতে ভেতরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে এলেন। এ কাপড়টা যদি এত ছেঁড়া, তালিমারা, জীর্ণ হয়, তাহলে এর আগে সমুর মা কি পরেছিলেন?

এবার ঘরের একদিকে চাল নেমে এসেছে, খুঁটি দিয়ে ঠেকো দেওয়া হয়েছে। তক্তপোশটা ঘরে দেখলেন না সুজাতা। মেঝেতে ইটের ওপর তক্তা পাতা। সম্ভবত বারান্দায় আর রান্না হয় না এখন। ঘরের কোণেই ছোট উনোন, উপুড় করা হাঁড়ি, দু একটা বাসন।

সমুর মার চেহারা আরো শীর্ণ, বিধ্বস্ত। দুর্ভাগ্যের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করলে যেমন হতাশ্বাস, হালছাড়া দশা হয়, তাঁকে তেমনই দেখাচ্ছে। কোন কোন ফুটপাতে পড়ে থাকা মানবকে নর্দমার বেড়ালছানা, রোঁয়া-ওঠা কাগের বাচ্চার চেহারায় এই রকম করে আসন্ন, নির্মম মৃত্যুর পূর্বাভাস এসে পড়ে।

অথচ সমুর দিদির চেহারা আরো এক রোখা, উদ্ধত, ক্রুদ্ধ। এক বছরে ওকে নিশ্চয় নখে দাঁতে যুদ্ধ করে চলতে হয়েছে, তাই ও জ্বলে পুড়ে এমনি করে খাঁক হয়ে গিয়েছে! সুজাতা ক্ষুধিত, তৃষিত চোখে সমুর মাকে দেখতে লাগলেন, এই ঘরটাকে। মন বলে দিচ্ছে এখানে আর আসা হবে না। আর সমুর মার কাছে বসে তিনি অনুভব করবেন না তিনি একা নন। আগামী সতেরই জানুআরি কি করবেন সুজাতা? গত সতেরই জানুআরি থেকে আজ পর্যন্ত, একবছর ধরে জানতেন তাঁর যাবার, গিয়ে বসবার একটা জায়গা আছে। কিন্তু আজ নিঃশব্দে তাঁকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে গেল সমুর দিদি। বুঝিয়ে দিয়ে গেল এখানে সুজাতা অবাঞ্ছিত।

তাই সুজাতা আকুল, ক্ষুধিত চোখে দেখতে লাগলেন ঘরটাকে,

সমুর মাকে। এই ঘরেই জীবনের শেষ ক'টা ঘণ্টা কাটিয়েছিল ব্রতী, সমুর মার পাতা সামান্য বিছানায় শুয়েছিল। সমুর মা সুজাতার ছেলেকে শেষ মুহূর্তের কিছুক্ষণ আগে অবধি কাছে পেয়েছিলেন।

সমুর মা বলেছিলেন, আপনে বেথা পাইছেন, তাই আসেন। আমি ত দিদি! চক্ষু থাকতে কানা, পা থাকতে লেংরা। আচ্ছা দিদি মাইয়া কয়, অ সমুর দিদি বইলা কেও অরে কাম দিব না! এ কি সইত্য?

কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে তা সুজাতা কেমন করে জানবেন? যারা ছিল বিশ্বাসহীন তারা বর্তমানে নেই। কিন্তু তাদের পরিবারগুলো ত আছে। তাদের বিষয়ে নীতি ছিল অলিখিত, কিন্তু কার্যকরী। তাদের পরিবারগুলোর বিষয়েও কোন অলিখিত নীতি আছে?

সে সময়ে আড়াই বছর ধরে বরানগর কাশীপুরকে শোধিত করবার সময় পর্যন্ত এদের বিষয়ে সকলে নীরব থাকবার অলিখিত নীতি অনুসরণ করছিল। জাতীয় কার্যকলাপে, টোকিওতে হাতি —মেক্সিকোয় চিত্রোৎসব—ময়দানে শিল্পী-সাহিত্যিক—রবীন্দ্রসদনে কবিপক্ষ—এই সব কিছুর পেছনে এক সুপরিকল্পিত মনোভাব কাজ করছিল।

বিচলিত হবার দরকার নেই, কেননা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই ঘটে নি। কয়েক হাজার ছেলে নেই বটে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আর কোন মা'র একথা মনে হয় কিনা কে জানে, কিন্তু সুজাতার সেদিনও মনে হত, আজও মনে হয়, কেবল পশ্চিমবঙ্গে তরুণরা আজ তাড়িত, ত্রস্ত, বিধ্বস্ত। তবু তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অন্যত্র ঘটেছে। ওদের অস্তিত্ব, যন্ত্রণা, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে অবিচল বিশ্বাস, সবকিছু সমগ্র জাতি ও রাজ্য সেদিন অস্বীকার করেছিল।

সুজাতার সবচেয়ে যাতে ভয় করে আজকাল, তা হল এই যে অস্বীকার করে সমস্ত রাজ্যজুড়ে সবাই স্বাভাবিকতার ভান করছিল, সেটা কারো কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। এই স্বাভাবিকতা

যে কি ভয়ংকর, কি পাশব, কি হিংস্র, তা সুজাতা মর্মে মর্মে জানেন। ব্রতীরা জেলে মরছে, পথে মরছে, কালো ভ্যানের তাড়া খাচ্ছে, উন্মত্ত জনতার হাতে মরছে, সমস্ত জাতির যারা বিবেকস্বরূপ, তারা কেউ ব্রতীদের কথা বলছে না। সবাই এই একটি ব্যাপারে চুপ করে আছে।

তাদের এই স্বাভাবিকতা সুজাতার কাছে ভয়ংকর লাগে। ভয় করে, যখন দেখেন তারা নিজেদের স্বাভাবিক, বিবেকবান ও সহৃদয় মনে করছে। বাইরে তাদের দূরদৃষ্টি বহুদূর প্রসারিত, ঘরে সেই দৃষ্টি অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট, ঝাপসা।

কয়েক হাজার দেশের ছেলেকে উপেক্ষা কর। উপেক্ষা কর পুরোপুরি। তাতেই তারা অনস্তিত্ব হয়ে যাবে। জেলে আর ধরছে না? হাজার হাজার ছেলের খবর জানা যাচ্ছে না? ইগনোর কর। তাতেই তারা অনস্তিত্ব হয়ে যাবে।

কিন্তু তাদের পরিবারবর্গ? তাদেরও কি উপেক্ষা করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নীতি সাব্যস্ত হয়েছে?

সুজাতা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। বললেন, আমি ত দেখুন কাজ করছি।

আপনাদের লগে আমার মাইয়ার কথা দিদি! আপনার চিনাজানা কতডি! দেহেন না, সকলডি নাম উঠল। ব্রতীর নাম কাগজে উঠল না। আমার দিদি! না আছে জানাচিনা, না আছে টাকার জোর!

সুজাতা জানতেন সমুর মার মনে এই ব্যবধানবোধ আসবে। প্রচণ্ড আঘাত, নিদারুণ শোক, কাঁটাপুকুরে ও শ্মশানে তাঁদের দুজনকে এক করে দিয়েছিল বটে, কিন্তু সে সাম্য চিরস্থায়ী হতে পারে না। সময় শোকের চেয়ে বলশালী। শোক তীরভূমি, সময় জাহ্নবী। সময় শোকের ওপর পলি ফেলে আর পলি ফেলে। তারপর একদিন প্রকৃতির অমোঘনিয়ম অনুযায়ী, সময়ের পলিতে চাপা পড়া শোকের ওপর ছোট ছোট অংকুরের আঙুল বেরোয়।

অঙ্কুর। আশার-দুঃখের-চিন্তার-বিদ্বেষের।

আঙুলগুলো ওপরে ওঠে, আকাশ খামচায়।

সময় সব পারে। সময়ের প্রবল প্রতাপের কথা ভাবলে সুজাতার ভয় হয়। হয়ত একদিন আসবে যেদিন ব্রতীর মুখ আবছা হয়ে ফ্যাকাসে হয়ে আসবে সুজাতার চেতনায়, পুরানো ফোটোর মতন। হয়ত একদিন সুজাতা সকলের কাছে ব্রতীর নাম সহজে করবেন, কাঁদবেন যখন তখন।

সময় সব পারে। দুবছর আগে তাঁকে আর সমুর মাকে শোক এক করে দিয়েছিল। সমীকরণের সে অঙ্ক সময়ের হস্তক্ষেপে মুছে গেছে। শোকের প্রচণ্ড আঘাতে সুজাতা ও সমুর মার শ্রেণী ব্যবধান ঘুচে গিয়েছিল।

সময় বয়ে গেছে, তাই সুজাতা, সমুর মার মনে শ্রেণী বিভক্ত হয়ে গেছেন।

সুজাতা জিগ্যেস করলেন, সমীরণের দিদি কি পাস করেছে?

ফাস্‌পাট দিছিল। ছেকেন পার্ট দিলে অ গ্রেজুয়েট অইত। তয় টাইপ শিখতে আছে। হেও ত অর্ধেক দিন যাইতে চায় না। কয় কাপর নাই, জামা নাই, চটি কিনতে পয়সা নাই, ঘামুনা আমি। কয় তোমাগো লিগ্যা এমন কইরা জীবন দিতে পারব না। রাগের কথা দিদি। মাইয়া অকর্তব্য নয়।

মনে হয় না সমীরণের জন্যে ওর কোন অসুবিধে হবে। তবু আমি দেখব, কাজের খোঁজ পেলে জানাব।

কয়েন কি দিদি। ভাল একখান টিউশন অর ছুইট্টা গেল। চল্লিশ টাকা পাইত। ছাত্রের বাপে কইল, না না তোমারে আমি রাখতে পারব না। তোমার ভাই আছিল হেই দলে। হ দিদি, সইত্য কই।

সবাই ত একরকম নয়।

দ্যাখবেন দিদি। তবে হে এট্টা বরো কাম করছে। ছুডো

দুডারে দিয়া দিছে গরমেণ্টের বোর্ডিঙে। বাপ না থাকলে অরা অনাথ আশ্রমে নেয়।

ভালই করেছে।

মাইয়া কয় দিদি! ব্রতীর মায়ে যে আছে এহানে, এ লিগ্যা কতজন জিগায় কত কথা। যারা তাগোরে মারছে, তাদের মধ্যে একজন ত কইয়া বইল, ব্রতীর মায়ে তর মায়ে হকলডি কি জোট বান্ধতে আছে? ছুঁচার গর্তে হাতির পা পরে ক্যান্? মাইয়া ত ডরাইয়া মরে। অ রাত্তেভিত্তে ফিরে ছেলে পরাইয়া, দোকান বাজার করে, অগোরে ডয়ার। অগো প্রসাধ্য কাম ন্যাই।

ওরা—ওরা মানে—?

হ দিদি! হেইগুলান। এহনত তারা হকলডি দল পালটাইছে। তাগোর-কুন-অ শাস্তি অইল না। অহন বুক ফুলাইয়া চলে ফিরে, আবার কয় কি মাইয়ারে, হেই! তর ভাইয়ের, ছাদ্দ করলি না ক্যান? ভাল কইরা খাইতাম! পিচাশ দিদি! ওই চায়ের দোকানে বইয়া থাকে।

সুজাতার মনে হল তিনি মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে সাইকেল রিক্শা নিয়ে চলে আসেন, কখনো ত ডাইনে বাঁয়ে চেয়ে দেখেন নি। চায়ের দোকানে যারা বসে তারাই কেউ কেউ ব্রতীর হত্যাকারী? এখনো তারা নির্বাধে ঘোরে, সমুর দিদিকে নির্মম ব্যঙ্গ করে, হা হা করে হাসে? এ কোন শহরে বাস করছেন তিনি, যেখানে এ সবও ঘটে, আবার সংস্কৃতি-মেলা, রবীন্দ্র-মেলা, সব পর পর হয়ে চলে নিয়ম মত?

দল এবং ঝাণ্ডা বদলালেই ঘাতকেরা নিষ্কৃতি পায়। এদিকে জেলের পাঁচিল শুধু উঁচু হয়, পাঁচিলে পাঁচিলে ওয়াচ টাওআর বসে, সব এক সঙ্গে চলেছে, চলেছে, কিন্তু আর কতদিন?

সমুর মা বললেন, আপনে ত দিদি ভাগ্যমানী? যার পোলা আছে হে একডারে লইয়া আরেকডারে ভোলতে পারে। তারে বুকে লইয়া হেয়ারে ভোলেন দিদি? আমার ত বুকের পাঁজরা খইসা গেছে। আমার বুকের চিতা, চিতায় না উঠলে নিবব না।

সুজাতার বলতে ইচ্ছা হল, সমুর মার মত বুক ফাটা অকুণ্ঠ, আর্ত বিলাপ করতে পারলে তিনি বেঁচে যেতেন। কিন্তু তিনি যদি সমুর মাকে বলেন, ব্রতীর জন্যে তিনি বুকে পাষাণ বহন করছেন, ভাল করে কাঁদতে পর্যন্ত পারেন নি, তা হলে সমুর মা তাঁকে অস্বাভাবিক ভাববেন! ব্রতীর খবর পেতে না পেতে যারা সে খবর চাপা দিতে ছুটে যায়, তাদের সামনে ব্রতীর জন্য কাঁদতে পারেন নি সুজাতা, তাঁর গলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমুর মা তা বুঝবেন না।

সমুর মা, বাবা যে তখন সে সব কথা কিছুই ভাবেন নি?

রাত যখন বারোটাও বাজে নি···দুঃস্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন মনে হয় সব ···রাত তখন বারোটাও বাজেনি, সমুদের বাড়ি ঘিরে ফেলেছিল ওরা। একজন একজন করে লোক জমতে দেখেই সমুর মা ফুঁপিয়ে উঠে মুখে হাত চাপা দিলেন। সমুর বাবা অসহায় কাতরভাবে বললেন, কি করি অহন! যাই দেখি গিয়া পাছু দুয়ার দিয়া নি পলান যায়···

সমু আস্তে বলল, লাভ নাই বাবা। অরা ওদিকও ঘেরছে। আমি সারা পাইছি।

বের করে দিন ওদের। চাপা হিংস্র গলা।

—বাবুর গলা না? সমুর বাবা বললেন।

বের করে দিন! হিংস্র গলা।

লয় ত ঘরে আগুন দিমু! বাইর হইয়া আয় সমু।

বাপের বেটা হইস ত বাইর হ।

সমু ঘাড় ফিরিয়ে বলল, আমি যদি আগে বাইরাই; অরা আমায় আগে লইব! তরা একজনও পলাইতে পারবি না?

বাইর—হ—!

ব্রতী তখন সমুকে বলেছিল, লাভ নাই সমু! তুই একা যাবি কেন? একসঙ্গে যাব।

দুঃস্বপ্ন···দুঃস্বপ্ন সব।

ব্রতী আগে উঠল। জানলার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, গালি দেবেন না, আমরা আসছি। অপেক্ষা করুন।

হালায় আরেক মালরে জুটাইছে। বাইর হ ঘটির পোলা। বাইর হ!

যাইস না সমুরে-এ-এ-এ-এ!

কাইন্দনা মা। বাবা, তুমি মারে দেহ, আমরা বাইরাই। লয় ত অরা ঘরে আগুন দিব!

বিজিত পাজামা শক্ত করে বেঁধেছিল, হাত বুলিয়ে চুল আঁচড়ে নিয়েছিল। পার্থ কখনোই বেশি কথা বলত না। এ সময়ে পার্থ বলল, চল্ বিজিত।

বিজিত আর পার্থের কাছে টিপছুরি ছিল, সমু আর ব্রতী ছিল নিরস্ত্র। ওরা উঠে দাঁড়িয়ে হাতে হাতে ধরে স্লোগান দিতে দিতে দরজা খুলে ফেলে।

তর আগে আমি মরুম, বলে সমুর বাবা এগিয়ে যান, কিন্তু সমু তাঁকে ঠেলে ফেলে দেয়। স্লোগান দিতে দিতে ওরা বেরোয়, বাইরে অন্ধকার, বাইরে অনেকগুলো ঘুটঘুটে আধার মুখ হা-হা হাসি ও উল্লাসে, চীৎকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়া তাদের হাসি, বাড়ি বাড়ি আলো নিভে যাচ্ছে, দরজা জানালা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, চমকে সরে যাচ্ছে ভয়চকিত মুখ, ওদিকে আকাশ পানে চুই-ই করে ছুঁড়ে দেওয়া শিস, চুমকুড়ি দুর্গাভাসানে যেমন হয়, ওদের গলায় স্লোগান। বিজিত আর পার্থ স্লোগান দিতে দিতে ছুরি সোজা করে ধরে ছুটে গেল, কার গলায় মারছে রে! আর্তনাদ—হালা চাক্কু চালাস? কে বলল, ল হালাদের। স্লোগান তিনটে গলায় বিজিতের গলায় আগেই কে একজন দক্ষ নিপুণতায় ফাঁস দেয়—স্লোগান—স্লোগান—স্লোগান'—'জিন্দাবাদ যুগ যুগ জীও!'—'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ! যুগ যুগ জীও! ভয়ংকর গণ্ডগোল—

স্লোগান সহসা থেমে গেল। সমবেত ঘাতকেরা দূরে চলে যাচ্ছে—গুলির শব্দ—খট খট খট শীতের থমকা বাতাসে বারুদের গন্ধ—বাতাসে বারুদের গন্ধ—অন্ধকারে মুখগুলো চলে গেল—হো হো হো করে—সমুর বাবা চীৎকার করে বুক চাপড়ে পড়ে গেলেন—সমুরে! দাদা গো! বোনদের আর্তনাদ—সমুর মা আর কিছু জানেন না। অজ্ঞান। অন্ধকার। অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার।

সমুর মা কেমন করে বুঝবেন, সুজাতা কেন কাঁদতে পারেন না? কেমন করে বিশ্বাস করবেন ও বাড়িতে ব্রতীর নামই কেউ পারতপক্ষে উচ্চারণ করে না? কেমন করে ভাববেন ব্রতীর নাম যাতে কাগজে না ওঠে সে জন্যে ব্রতীর বাবা কি আকুল ছোটাছুটি করছিলেন?

কেননা সমুর বাবা নিজেকে বাঁচাবার কথা ভাবেন নি, ভাবা যায় তাও তিনি জানতেন না। যারা ভাবে, ভাবতে পারে, তাদের সঙ্গে সমুর বাবা—হেয় আছিল দরিদ্র দোকানী—পুঁজি আছিল না—সমুর বাবার কোন পরিচয় হয় নি কোনদিন। দিবানাথরা আর সমুর বাবারা এদেশে দুই মেরুতে বাস করেন।

সমুর বাবা তখন ভেবেছিছেন থানা পুলিসের দ্বারস্থ হলে সব চুকে যাবে। ভয় পেয়ে পালাবে সবাই। ছুটে হাঁপিয়ে, কোনমতে তিনি থানায় গেলেন। এ সময়ে থানা রাতে দিনে দীপান্বিত—চলেন ছার, এহন গ্যালেও পোলায় বাঁচব—হয়ত বা হাসপাতালে লইতে লাগবে চলেন ছার, পায়ে ধরি আপনার।

কিন্তু থানার বাবু বয়সে না হলেও অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞ। সমুর বাবা যখন নামগুলো করেন আততায়ীদের, ভীষণ ধমকে ওঠেন তিনি। সমুর বাবা বড় অসহায় জীব—এ সংসারে কেঁচো কেন্নোর মত—সবাই পায়ে দলে চলে যায়—তিনি ভয়ে চুপ করে যান, আবার ডুকরে ওঠেন—আমি দেখছি স্বচক্ষে—গলা শুনছি।—না, গলা শোনেন নি।—চলেন ছার।—যাবে, ভ্যান যাবে। সে সময়

সমুর বাবা হঠাৎ ওই থানায় আরেকজন বাবুকে দেখে চিনতে পারেন ও ডুকরে কেঁদে পা ধরেন। তারপর কোন একসময়ে ভ্যান আসে। সমুর বাবা ভ্যানে চড়ে বসেন। কলোনীতে ঢুকতে না ঢুকতে তিনি পাগলের মত, সমু! সারা দেও বাপ। সমুরে!—বলে খাবি খেতে থাকেন। আশ্চর্য, ভ্যানকে নির্দেশও দিতে হয় না। ঠিক ফুটবলের মত মাঠে চলে যায় ভ্যান। দূর থেকে ভ্যানের আলো পড়তে ছিটকে সরে যায়, কারা যেন পালাতে থাকে। দূর থেকে ভ্যানের আলোর থাবায় ধরা পড়ে কতকগুলো মুখ, মানুষ, ভ্যান তখন কেন যেন খুব ধীরে নামিয়ে আনে গতিবেগ। ভ্যান যখন পৌঁছয় তখন আর কেউ থাকে না, সকলেই পালিয়ে যাবার সুযোগ পায়। কাছে যেতে ভ্যান থামে ও ভ্যানের আলো জ্বলতে থাকে বিজিতের ওপর। সমুর বাবা টর্চের আলো যার যার ওপর পড়ে তাকেই দেখেন ও চেঁচাতে থাকেন। তারপর, সমু! বলতে গিয়ে তিনি ঢলে পড়েন মাটিতে। দেখেন সমুর পা ধরে আগে নিয়ে যাচ্ছে ওরা, ভ্যানের হাঁ খিদের বড় হচ্ছে। সমুকে গিলে নেয়। সমুর মাথা কিসে ঠুকল! অজ্ঞান হয়ে যেতে সমুর বাবা বলতে যান—আর মাথা বাঁচাইয়া! বলতে পারেন না। তখন সোয়া তিনটে। এত তাড়িঘড়ি কোনদিন ভ্যান আসে নি।

তারপর সব চুকেবুকে গেলে তিনি আবার থানায় যান। তাঁর জবানবন্দী লেখাই হয় নি জানেন। থানাবাবুর কথা লালবাজারে বলতে যান। কিছুতে কোন লাভ হয় না। হা ভগবান! এ দেশে বিচার নাই রে! বলে তিনি ফুটপাতে মাথা কাটেন। তাঁর শালার ছেলে তাঁকে ধরে ধরে বাড়ি আনে।

সমুর মা কেমন করে বুঝবেন সুজাতার কথা? তিনি যদি বলেন, ব্রতী, একমাত্র ব্রতীই তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ত, তাঁর ঘাড়ে হাত রেখে কথা বলত, বলত আমার পিঠে সাবান দিয়ে দাও, মা! হেম আবার ঠাণ্ডা চা দিয়েছে, আজ ব্যাঙ্কের পর আমি

আর তুমি সিনেমায় যাবে, মা! আজই খাতাটা ফেরত দেব—নোটটা কপি করে দাও। সমুর মা ভাববেন, এ রকম ত সব ছেলে সব মাকেই বলে। এতে বিশেষ করে বলবার কি আছে?

সুজাতা যদি বলেন, তিনি যে মাটি ছাড়া—শেকড় ছাড়া জীবন-বিচ্যুত সমাজে বাস করেন, সে সমাজে নগ্ন শরীর লজ্জার নয়, সহজ আবেগ লজ্জার। যদি বলেন, সে সমাজে মা-ছেলে, বাপ-ছেলে, স্বামী-স্ত্রী প্রতিটি সম্পর্ক বিষিয়ে গেলেও কেউ কাউকে মারে না, বুক ফাটিয়ে কাঁদে না, সকলে সকলের সঙ্গে মধুর ও মার্জিত ব্যবহার করে চলে, তা হলে সমুর মা বুঝতেই পারবেন না সুজাতা কি বলছেন! ভাষাটা বাংলা হলেও, ভাষার অন্তরের বক্তব্য সমুর মা বুঝবেন না।

সুজাতা যদি বলেন, ব্রতীকে, তাঁর মতে সন্তানকে বোঝাবার জন্যেই তিনি এখানে আসেন ঃ তাও সমুর মা বুঝবেন না। সুজাতা যদি বলেন, ব্রতী যখন বদলে যেতে শুরু করে; সে কিছু কিছু বই পড়ে বা বুলি শুনেই বদলে যায় নি। সমুর মত দরিদ্র বাপ-মার সন্তান, লালটুর মত ভাগ্যপ্রহৃত অপমানিত যুবক, এদের এবং অন্যান্য মানুষদের জীবনের জ্বালা নিজের রক্তমাংসে অনুভব করেই ব্রতী বদলেছিল। জীবনই তাকে বদলে যেতে বাধ্য করে। তাই সে নিজের নির্দিষ্ট জীবন ত্যাগ করে। সে জীবনে থাকলে ব্রতী বিলেত যেত, ফিরত, বিরাট চাকরি করত, সমাজের ওপর-তলায় উঠে যেত অতি সহজে, বিনা চেষ্টায়।

সে কথাও সমুর মা বুঝবেন না। কেননা সমুর মা এখনি বললেন, আপনের পোলার মুখখান আমার মনে লয়ে চয়ে দিদি। যাগো কিছু নাই, তারা খ্যাপা-ক্ষ্যাপ্ত হয়। সমু ছুড়কাল অইতে কইত, ক্যান, আমরা কি ভিখারী যে যা হক্কলে পাইবার কথা তাই ভিক্ষা কইরা চাইয়া নিমু আর লাথ খামু? কিন্তু ব্রতীর ত হকল আছিল দিদি! হে ক্যান বা মরতে আইছিল?

ওদের সাবধান করতে এসেছিল ?

আপনে ত জানতেন পোলা কুন পথ লইছে। আপনে অরে সাবধান করেন নাই ?

সমুর মা জানেন না তিনি আজ বিজয়িনী, কেননা তিনি জানতেন সমু কি করছে। সুজাতার উন্নতগ্রীবা, অভিজাত চেহারা, মণিবন্ধে ঘড়ি, দামী তাঁতের কাপড় থাকতে পারে। কিন্তু সমুর মা জানেন না সুজাতা কয়েক হাজার জননীর মধ্যে বহুজনের কাছে পরাজিত, কেননা তিনি জানতেন না ব্রতী কি করছে।

কি জয়ে, কি পরাজয়ে সুজাতা মিথ্যে কথা বলতে পারেন না।

ব্রতী জানত।

সুজাতা বললেন, আমি জানতাম না।

জানলে কি দিদি! পোলারে কেউ মরতে পাঠায় ?

সুজাতা উঠে দাঁড়ালেন।

আবার আসবেন দিদি। আপনার লগে কথা কইয়া বরো শান্তি।

সুজাতা জানালেন, তিনি আর আসবেন না।

চলি।

সহসা সমুর মার গায়ে হাত রাখলেন সুজাতা। বললেন, আপনার কাছে আমার অনেক কৃতজ্ঞতা রইল।

আর কৃতজ্ঞতা! দুঃখী বুকের দুঃখীর ব্যথা।

আজ, শেষ বিদায়ের মুহূর্তে সুজাতার সমুর মাকে খুব দামী কিছু দিতে ইচ্ছে হল, ইচ্ছে হল, নিজের ভেতরকার নিজের শোকসৃষ্টি কারাগার থেকে একটা কিছু দিয়ে যান সমুর মাকে। তাই, যে কথা তিনি উচ্চারণ করতে পারেন না, সেই কথাটা আজ বললেন, যেদিন ওরা মারা যায়, তার পরদিন ব্রতীর জন্মদিন ছিল। ও, সতেরই, কুড়ি পেরিয়ে একুশে পড়ত।

বিকেল

বাড়িটা তাঁর বাড়ির কাছেই। যেতে আসতে সুজাতা বাড়িটা অনেকবারই দেখেছেন, কখনো ঢোকেন নি, কার বাড়ি তা জানেন না। পুরনো দিনের দোতলা বাড়ি, সামনে টানা বারান্দা, বাড়ির ওপরে মেট্রো নক্‌শা, গায়ে লেখা পূর্ব-গঙ্গা নগর, সম্ভবত মালিকের গ্রামের নাম। সুজাতার চোখের সামনে বিশ বছরের বাড়িটার চেহারা কলকাতার মত হয়ে গেল। খানিকটা নতুন ঝকঝকে, এনামেল রঙে উদ্ধত, জানালার নিচে এয়ারকুলার। খানিকটা জীর্ণ, পলেস্তারা খসা, জানালায় শাড়িকাটা ময়লা পর্দা। নিচে রাস্তার সামনে ঘরে ঘরে ধোবিখানা, হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকান, রেডিও মেরামতী দোকান। শরিকে শরিকে ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য ভাগ হয়ে গেছে, বোঝা যায়।

অন্ধকার প্যাসেজ পেরিয়ে শরিকী উঠোনের পাশে একটা বড় ঘর। বাড়িটার পেছন দিক এটা। সামনে একটা অযত্নের আতা-গাছ। ঘরটার দেওয়াল ও ছাতের আস্তর খসা, মেঝের সিমেণ্ট ওঠা। একটা বড় তক্তপোশ। আলমারিতে ময়লা ও অব্যবহৃত আইনের বই, আলমারির তলায় জং। সুজাতা তক্তপোশে বসেছিলেন। নন্দিনী তাঁর সামনে, মোড়ায় বসে।

বিয়ে করেছিল অনিন্দ্য।

নন্দিনী আবার বলল। আগেও বলেছে কথাটা, এখনো যখন বলল, ওর চোখে সামান্য বিস্ময়, ভাসমান মেঘের মত অস্থায়ী ছায়া ফেলে চলে গেল। যেন ও এখনো সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে না, অথবা ভেবে পায় না, এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সমুরা নিহত হতে পারে জেনেও অনিন্দ্য কেমন করে এ কাজ করেছিল।

আমি সব কথা জানি না নন্দিনী।

জানি, আপনারা কখনোই কোন কিছু জানেন না। যা হয়, সব

যেন একেকটা ঘটনামাত্র ; কেন হয় কেমন করে হয়···তা জানলেও চলে যায় যে বিশ্বাসটা ঠিক নয় এখন দেখতে পাচ্ছেন।

সুজাতা কথা বললেন না।

অনিন্দ্য বিট্রে করেছিল। ব্রতী, লাইক এ ফুল, অনিন্দ্যকে বিশ্বাস করেছিল। তার কারণ অনিন্দ্যকে এনেছিল নিতু, ব্রতীর বন্ধু।

নিতু যাকে এনেছে, তাকে অবিশ্বাস করা চলে না, ব্রতী তাই ভেবেছিল, কেননা নিতু ব্রতীর বন্ধু। নিতু কি জেনেশুনেই অনিন্দ্যকে এনেছিল ? সুজাতা মনে মনে ভাবলেন।

বহুদিন সলিটারি সেলে একা থাকলে বোধহয় মানুষের মন অত্যন্ত অনুভূতিপ্রখর হয়ে যায়। কেননা সলিটারি সেল বড় একাকী, বড় নির্জন, সেখানে মানুষ চারদেওয়াল, লোহার কপাট ও দেওয়ালে একটি ফোকরের পাহারায় নিজের সঙ্গে বড় একা একা বাস করে। সব সময়েই মনকে লাশঘরের ডাক্তারের ছুরি অথবা রেয়নেটের ফলার মত তীক্ষ্ণ, শাণিত, একলক্ষ করে সলিটারি সেলের মানুষ বাইরের জগৎকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে জানতে যায় কে তাকে মনে রেখেছে ? মাঝে মাঝে দরজা খুলে যায়। তখন যেখানে যায়, তাও তার কাঙ্ক্ষিত বাইরের জগৎ নয়। সে ঘর অন্যরকম। সাউণ্ডপ্রুফ। দরজা-জানালায় ফেল্টমোড়ানো ফাঁপা রবারের নল বসিয়ে সাউণ্ডপ্রুফ করা। ঘরের আর্তনাদ, গোঙানি, মারের আওয়াজ, জেরাকারীর গর্জন, সব শব্দ ওই নলের জন্য ঘরের ভেতরেই বন্দী থাকে। সে ঘরে যাকে জেরা করা হচ্ছে, তার চোখের ওপর হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলে। যে জেরা করে সে থাকে অন্ধকারে। সে সিগারেটখোর হোক বা না হোক, হাতে সিগারেট জ্বলে। কখনো কখনো 'ও, আপনি চ্যাটার্জির বন্ধু ? এ হেন সামাজিক ভদ্র প্রশ্ন মিহিগলায় করে শিক্ষিত ভদ্রবংশের জেরাকারী জ্বলন্ত সিগারেটটা হাজার ওয়াটে উদ্ভাসিত মুখের ওপর চেপে ধরতেও পারে। সিগারেটের ছ্যাঁকায় শুধু 'সারফেস্ কিউটেনাস ইনজুরি' হয়। চামড়া সামান্য পোড়ে। সে পোড়ার ঘা মলম লাগালে সেরে যায়।

তখন 'সারফেস্ টিউটেনাস হীলিং' হয়। চামড়ার ঘা ওপর ওপর সেরে যায়। কিন্তু ভেতরে, তরুণ হৃদয়ে, প্রত্যেকটা ছাঁকা চিরকাল ক্ষত হয়ে থাকে, থেকে যায়। তারপর আবার সলিটারি সেল। নিজের সঙ্গে একা।

নিজের সঙ্গে একা থাকলে মন অনুভূতিপ্রখর হয়। লাশঘরের ডাক্তারের ছুরি অথবা বেয়নেটের ফলার মত তীক্ষ্ণ, শাণিত, একলক্ষ। তাই নন্দিনী বুঝতে পারলে সুজাতা নির্বাকে প্রশ্ন করেছেন নিতু জেনেশুনেই অনিন্দ্যকে এনেছিল কিনা?

নন্দিনী বলল, নিতু অনিন্দ্যকে জেনে এনেছিল কিনা, অথবা না জেনে, সে আর কোনদিন জানা যাবে না। নিতুর কি হয়েছিল জানেন?

না।

নিতুর অনেকগুলো অ্যালায়াস ছিল। অনেক দাম। ব্রতীরা সরে যাবার পর অসম্ভব রাউণ্ড আপ হতে থাকে। ওর এলাকার সবাই ওকে দীপু বলে জানত। নিতু সেই সময়ে পালায়। ও কাছাকাছিই গিয়েছিল। ইনডাসট্রিয়াল বেল্টে। সেখানে, এমন ব্যাপার, ওকে সম্পূর্ণ অন্য আরেকজন মনে করে লোকাল থানায় ধরে। সেই সময় সেখানে গিয়ে পড়ে ওর অঞ্চলের থানার ও. সি.। ও. সি-র তখন ওখানে যাবার কথা নয়। কিন্তু কাগজও আমাদের বিট্রে করছিল। কোথায় হাই আউট, কোথায় হাসপাতালের ব্যবস্থা, কোথায় গ্রামে কাজ চলছে, ওরা মাঝে মাঝেই ছাপছিল। প্রবন্ধ লিখছিল। সেইরকম একটা খবরের পর ও. সি. ওই বেল্টে যায়। জীপ থামিয়ে ও চা খেতে ঢুকেছিল। আর গুড় নিতে।

গুড় নিতে!

হ্যাঁ! ওখানকার আখের গুড় ফেমাস। ওর জন্য দু হাঁড়ি কেনা ছিল। ও ঢুকেই নিতুকে দেখে। বলে, দীপু, তুমি? নিতু তখন ভয়ে, জেরার চোটে মার খেয়ে, খুব নার্ভাস ছিল। বলে ফেলে হ্যাঁ! দেখুন না, আমাকে এরা ধরে এনেছে। ও. সি. ওকে তখুনি জীপে তুলে নেয়। পথে হোটেলে খাওয়ায়, সিগারেট দেয়।

যেহেতু নিতু পাড়ার অত্যন্ত পপুলার ছেলে, কোন অ্যাকশনই পাড়ায় করেনি সেহেতু ও ভেবেছিল বেরিয়ে আসতে পারবে।

পারে নি?

না। ওকে পাড়ায় এনে থানার সামনে পিটিয়ে মেরেছিল। পাড়ার মেয়েরা সেদিন প্রোটেস্ট জানাতে গিয়েছিল। তাদের ওপর টিয়ারগ্যাসিং হয়।

কাগজে বেরোয় নি?

না।

তারপর?

নিতু নেই। অনিন্দ্যর সব উদ্দেশ্য ও জানত কিনা তা কোনদিন জানা যাবে না। তবে আমার মনে হয়,...

কি?

জানা উচিত ছিল।

কার? নিতুর?

যাকে চেনেন না, তার নামটা সহজেই বলতে পারলেন সুজাতা, ব্রতী কি তাঁকে এদের সঙ্গে, যাদের জানেন না সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেছে?

হাঁ। তার, আমার, ব্রতীর।

কি জানা উচিত ছিল?

আমরা যা করেছি, তার সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের প্রোগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা প্রোগ্রাম অন্যদের ছিল।

কি প্রোগ্রাম?

কেন, বিট্রেয়ালের।

নন্দিনী শান্ত, নিরুত্তাপ, প্রায় উদাসীন গলায় বলল। এখন সুজাতা বুঝলেন, অনিন্দ্য নামটা উচ্চারণের সময়েও চোখ দিয়ে বিস্ময়ের ছায়া ক্ষণিক মেঘের মত ভেসে যেতে দেখেছিলেন। সে বিস্ময়টা অনিন্দ্য যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে জন্যে নয়। বিস্ময় ওর, ব্রতীর এবং অন্যদের জন্য। সব রকম স্থায়ী ব্যবস্থায় প্রচণ্ড

বিশ্বাসহীনতাকে ওরা প্রজ্বলন্ত বিশ্বাসে গ্রহণ করেছিল। সেই সঙ্গে কেউ কেউ যে সুপরিকল্পিত ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলতে পারে বন্ধু সেজে, খবর লিখে, তা ওরা ভেবে দেখে নি বলে বিস্ময়।

সব কিছুকে মনে হয় বিট্রেয়াল।

নন্দিনী আবার বলল। সুজাতা দেখলেন ওর শীর্ণ, কালো, ক্লান্ত মুখে চোখের নিচে এক স্থায়ী ছায়া। পাহাড়ের ঢালু গায়ে সানুদেশে ওরকম করেই ছায়া স্থায়ী হয়ে থাকে। পাহাড়ের সানুদেশে কোন অজানা জায়গা চিরছায়ার দেশ।

মনে হল নন্দিনীকে কোনদিন চেনা যাবে না, জানা যাবে না। সহসা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে মনে হল, শূন্যতার অনুভূতি। ব্রতী যাকে ভালবেসেছিল, তাকে কোনদিন জানবেন না, চিনবেন না, তার মন তাঁর কাছে চির অচেনা হয়ে থাকবে, ভাবতে সুজাতার বড় কষ্ট হল। ব্যথা। সমুর মার কাছে আর যেতে পারবেন না। নন্দিনীকে কোনদিন ভাল করে চিনতে পারবেন না, বড় ব্যথা, বড় ক্ষতির শোক। নন্দিনীর কোন বিশ্বাস, কোন অভিজ্ঞতা সুজাতা ভাগ করে নেন নি, বুঝতে বা জানতে চেষ্টা করেন নি নন্দিনীদের, ব্রতীদের। যা যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তার কতটা অপচয়, কতটা সার্থকতা, কে তাঁকে বলে দেবে? সুজাতার স্বভাব ও মনের ঘাটতিগুলোকে সুজাতা এমনি করে চিনবেন সেই জন্যেই কি ব্রতী সেদিন সন্ধ্যায় নীল শার্ট পরে বেরিয়ে গিয়েছিল? সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে চেয়ে দেখেছিল সুজাতার মুখের দিকে?

যদি সেই সময়টা ফিরে পান সুজাতা তবে নেমে যান সিঁড়ি দিয়ে। জড়িয়ে ধরেন ব্রতীকে, তাঁর আত্মজকে। বলেন, সব আমি জানব ব্রতী, সব জানতে শুরু করব। শুধু তুই বেরিয়ে যাস না ব্রতী। কলকাতায় একটা বিশ বছরের ছেলে এ পাড়া থেকে ওপাড়া যেতে পারে না রে। তুই যাস না।

সময় ফিরে পাওয়া যায় না। সময় চলে যায় নির্মম, ঘাতক,

নিয়তিসমান সময়। সময় জাহ্নবী, শোক বেলাভূমি। সময়ের স্রোতে শোকের ওপর পলিমাটি চাপা পড়ে। তারপর একদিন সেই পলিমাটি ফুঁড়ে নতুন নতুন অঙ্কুরের আঙুল বেরোয়। আঙুলগুলো আকাশপানে আবার উঠতে চায়। আশার, বেদনার, সুখের, আনন্দের অঙ্কুরের আঙুল।

সব, সবাইকে বিট্রেয়াল মনে হয়।

সুজাতার চিন্তা দেওয়ালের ওপার থেকে নন্দিনী বলল।

এতে তোমার কষ্ট বাড়বে নন্দিনী।

না না। বরং ব্রিটেয়ালও যে আছে তা যখন জানতাম না তখন নিজেদের ওপর বিশ্বাস ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু সে বিশ্বাসে কোন বনেদ ছিল না। তাই, হোয়েন আই স্টার্টেড্ ডাউটিং, হোয়েন আই থট অ্যান্ড থট ওভার দি ফ্যাক্ট্স্, আমি অনেক বেশি শিওর হতে পারলাম। নাউ আই নো হোয়্যার আই স্ট্যান্ড।

ডাজ্ ইট হেল্প য়ু এনি?

হ্যাঁ। এখন মনে হয়, তখন কত সহজে মনে হত সত্যিই একটা এরা শেষ হয়ে যাচ্ছে। উইং আর ব্রিংগিং এ নিউ এজ ইন। আমি আর ব্রতী শুধু কথা বলতে কতদিন শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর হেঁটে ফিরেছি। তখন যা দেখতাম, মানুষ বাড়ি-পথের-নিয়ম—ফুটপাতে ফেরিওয়ালার কাছে লাল গোলাপ, পথের ধারে ফেসটুন—বাসস্টপে সাঁটা খবরের কাগজ, মানুষের মুখে হাসি—পথের দোকানে কোন লিট্ল ম্যাগাজিনে কোন কবিতার সুন্দর ইমেজ—যখন ময়দানে মিটিঙে জনতার হাততালি—হিন্দী গানের সুন্দর সুর শুনতাম, আমাদের কি তীব্র আনন্দ হত—আনন্দ ধরে রাখা যেত না, উই ফেল্ট এক্সপ্লোসিভ। ফেল্ট লয়াল টু অল অ্যান্ড এভরিথিং—সে মন আর ফিরে আসবে না, আর ফিরে পাব না আমি। কোনদিন ফিরে পাব না। টোটাল লস্। একটা এরা সত্যিই শেষ হয়ে গেছে। সেদিনের আমি মরে গেছি।

কেন নন্দিনী? ব্রতী নেই বলে?

ব্রতী নেই, বন্ধো। আরো অনেক কিছু নেই। সলিটারি সেলে থাকতে ভেবে ভেবে আমিও শেষ হয়ে গেছি।

ওরকম করে বল না।

মাও আপনার মত করে কথা বলে! মা বোঝে না, আপনি বুঝবেন না।

একেবারে বুঝব না নন্দিনী?

কেমন করে বুঝবেন? আপনারা কি আমাদের মত করে নিজের লয়ালটি প্লেজ করেছিলেন? টু এভরিথিং অফ এভরি ডে লাইফ?

না। সুজাতা করেন নি। আনুগত্য গচ্ছিত রাখেন নি পথচারীর হাসিতে ভেসে আসা গানের টুকরোয়, লাল গোলাপে, উজ্জ্বল আলোয়, ঝুলন্ত ফেসটুনের কাপড়ে। সুজাতা কোথায়, কোন্ কোন্ জিনিসে আনুগত্য গচ্ছিত রেখেছিলেন?

এখন বুঝি কিভাবে বিট্রেয়াল চলেছিল। এখনো চলছে।

এখনো, নন্দিনী?

এখনো। নইলে জেলে জেলে পাঁচিল উঁচু কেন, কেন ওয়াচ টাওয়ার? কেন হাজার হাজার ছেলে জেলে আছে তবু কেউ একটি কথাও বলে না? যখন বলে, তখন দলের স্বার্থ বাঁচিয়ে তবে বলে? কেন? আমরা, যারা কাজ করতে চাই, একটা কাগজও ছাপতে পারি না? প্রেস, টাইপ, কিছু পাই না, অথচ অজস্র ম্যাগাজিন বেরোয়, শুধু বেরোয়, শোনা যায় সেগুলো সিমপ্যাথেটিক টু দি কজ? বিট্রেয়াল। কতজন বিট্রে করছে না জেনেও শুধু আলগা কথা বলে? কেন কতকগুলো কবি সে সময়ে বাংলাদেশ বাংলাদেশ করে মাতামাতি করে, আর এখন কেঁদে কেঁদে কবিতা লেখে? বিট্রেয়াল কেন এখনো রাউনড আপ, জেলে গুলি, ধরপাকড়? বিট্রেয়াল।

এখনো?

এখনো। কেন, কাগজে বেরোয় না বলে ধরপাকড় হচ্ছে না? গুলি চলছে না? কি হচ্ছে না? কেন হবে না? কি শেষ হয়েছে?

কিছু না। নাথিং ইজ এনডেড। ষোল থেকে চব্বিশ, একটা জেনারেশন শেষ হয়ে গেল। যাচ্ছে…

সুজাতা হঠাৎ যা করেন না, তাই করলেন। আবেগের বশে কাজ করা ওঁর স্বভাবে নেই। জীবনেও যা স্বাভাবিক ইচ্ছে, যাতে আগ্রহ, তা করতে সাহস পান নি। অল্প বয়সে দিব্যনাথ তাঁকে ঝড় দেখতে জানালায় দাঁড়ালেও শাসন করতেন। অল্প বয়সে স্বভাবে যে যে অনুশাসন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, আর সেগুলো অতিক্রম করা যায় না। তবু সুজাতা নন্দিনীর হাতে হাত রাখলেন। মনে মনে এই মুহূর্তেতেই কি সুজাতা জানছেন না, এই সময়, এই সুযোগ আর ফিরে পাবেন না তিনি? সময়ের মত পলাতক আর কে? ব্রতীর নীল শার্ট পরে সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকার অমূল্য দুর্লভ সময় আর ফিরে পাবেন না। এখন মনের নিচে, অতলে কি শূন্যতা, কিসের যেন অপরিমেয় শোক, নন্দিনীকে আর কাছে পাবেন না।

তাই সুজাতা নন্দিনীর হাতে হাত রাখলেন। নন্দিনী কি তাঁর হাত সরিয়ে দিয়ে তাঁকে তাঁর জীবনের অভ্যস্ত গণ্ডীতে ঠেলে দেবে আবার? সমুর দিদির চোখে যেরকম প্রত্যাখ্যান ছিল, নন্দিনীর চোখেও কি সেই প্রত্যাখ্যানই দেখতে পাবেন সুজাতা? ভাবতে গেলেই ভয় করছে। সুজাতা জানেন, এখন থেকে শুধু বাইরে দিব্যনাথ-জ্যোতি-তুলি-নীপা-বিনি ব্যাঙ্কের সহকর্মীরা, ভেতরে শুধু ব্রতী, শুধু ব্রতী কেন,—ব্রতী—সমুর মা—নন্দিনী, প্রত্যেকের সঙ্গে বিচ্ছেদের শোক নিয়ে গুমরে থাকা, সেটাই তাঁর সলিটারি সেল হবে। এখন থেকে তিনি একা হয়ে যাবেন, একেবারে একা, কেউ দরজা খুলে তাঁর নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়ে আর জিজ্ঞেস করবে না, আপনি ব্রতী চ্যাটার্জির মা?

কিন্তু নন্দিনী হাত সরিয়ে দিল না।

নন্দিনী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ভীরু কুণ্ঠিত, অনিচ্ছুক হাতে ওঁর হাতে নিজের আঙুল বোলাল। সুজাতা হাত নামিয়ে নিলেন। কৃতজ্ঞ তিনি, নন্দিনী তাঁর হাতে হাত রেখেছে।

আমি ব্রতীকে ভালবাসতাম।

ব্রতী তোমার কথা আমাকে বলেছিল।

বলেছিল?

হ্যাঁ। ষোলই জানুয়ারী।

আশ্চর্য!

কি?

আগে বলে নি?

না।

আমার মনে হয়েছিল, বললে ব্রতী আপনাকেই বলবে। বাড়িতে আর কারো ওপর ওর ফেইথ ছিল না।

ব্রতীর!

আপনি অবাক হচ্ছেন কেন?

ব্রতী অন্যদের সঙ্গে খুব ক্লোজ ছিল না। কিন্তু...

আশ্চর্য হবার কি আছে। বাবা, দিদি, দাদা হলে তাদের ভালবাসতে হবে? তাদের দিক থেকে কোন জেসচার না থাকলেও?

আমি জানি না নন্দিনী, ব্রতীকে আমি কত কম চিনতাম তা আজ বুঝতে পারি। তখন বুঝি নি।

বোঝার চেষ্টা করেছিলেন?

সুজাতা মাথা নাড়লেন। কখনো,কোন অবস্থাতেই তিনি মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। ব্রতী জানত।

আপনার আপনাদের জেনারেশনটাই এই রকম। আপনারা সব কিছু চান। ভালবাসা, বিশ্বস্ততা, বাধ্যতা। কেন চান, কেমন করে চান?

চাইব না নন্দিনী?

না। চাইবেন না। চাইবার অধিকার আপনারা কতজন ফরফিট করেছেন? আবার কতজনের বাবা মার সঙ্গে অন্য সম্পর্ক ছিল। অন্তু, দীপু, সঞ্চয়ন, অল হ্যাভ হ্যাপি লাইভস্! তবু তারা এসেছিল? কেমন করে এসেছিল। কে বলে দেবে?

তুমিই বল নন্দিনী।

ব্রতীর কথাই ধরুন। ওর বাবার সঙ্গে ওর কোন পরিচয় ছিল না। প্রথমে যখন জেস্‌চার বাবার দিক থেকে আসতে পারত, তখন বাবা কোন রিলেশান গড়তে চেষ্টা করেন নি। উনি আপনাকে ব্যবহার করতেন পাপোশের মত, ব্রতী বলত।

ব্রতী একথা বলেছিল ?

আমি কি করে জানব বলুন ?

ব্রতী বলেছিল !

সুজাতার মুখ লাল হয়ে গেল, তারপর স্বাভাবিক রং ফিরে এল। ব্রতী তাহলে সবই বুঝত। তাই মা'র ওপর ছিল সস্নেহ ভালবাসা। ছোটবেলা একেবারে, তিনি নীরবে কাঁদছেন দেখে ছয় বছরের ব্রতী বলেছিল আমি তোমাকে একটা বাঘ আর শিকারী ছাপা শাড়ি কিনে দেব।

ও বলত বাবা ঘুষ দিয়ে অন্যের ক্লায়েন্ট নিয়মিত ভাঙিয়ে আনেন। হি ইজ ওয়ান সি. এ. যে মরে গেলে কেউ দুঃখ করবে না। বলত আপনার মত স্ত্রী, চার ছেলে মেয়ে থাকা সত্ত্বেও উনি মেয়েদের নিয়ে নিয়মিত···একজন টাইপিস্‌ট মেয়েকে উনি ফ্ল্যাট ভাড়া করে রেখেছিলেন। ব্রতী সেজন্য ওঁকে শাসিয়েছিল, আপনি জানেন ?

কবে ?

নভেম্বরে। ব্রতী মারা যাবার দুমাস আগে।

এখন সুজাতা বুঝলেন কেন কয়েকমাস ব্রতী দিব্যনাথের সামনে আসে নি, কথা বলে নি। কেন দিব্যনাথ ব্রতীর নাম উচ্চারণ করেন নি। একবারও আগেকার মত বলেন নি, তোমার ছোট ছেলে কি বাড়িতেই থাকে ?

ওর দাদা দিদিরা বাবাকে অ্যাডমায়ার করত। ব্রতী বলত ওরা মানুষ নয়। ওর দিদি একটা নিমফো। ছোটটি একটা কমপ্লেক্স বোঝাই অসভ্য মেয়ে, দাদা একটা দালাল, ওর কাছেই শুনেছি। শুধু আপনার ওপর···আপনাকে ও ভালবাসত। সেই জন্যেই চলে যায় নি।

কোথায় চলে যায় নি ?

ওর বাড়িতে থাকার কথা নয়। মনে হয় আপনার জন্যে ও যাচ্ছিল না। কিন্তু উনিশে জানুয়ারী ওর, আমার, চলে যাবার কথা, আরো অন্যদের।

কোথায় ?

বেসে।

ব্রতী বাড়ি ছেড়ে চলে যেত ?

থাকলে যেত। অনিন্দ্য বিয়ে না করলে যেত। ব্রতীদের ডিস্‌ট্রাস্ট শুরু হয় বাড়ি থেকে। তারপর···

সমুর বাবা ব্রতীর বাবার মত ছিলেন না···

সমুদের ডিস্‌ট্রাস্ট অন্য দিক থেকে শুরু হয়। সমু ত বলত ওর বাবাকে ও আগে মারবে। খেপে গেলে বলত। বলত বাবা টেক্‌স এভারিথিং লাইং ডাউন। মাছওয়ালা থেকে পাড়ার মস্তান সবাই বুলি করছে জিনিস কিনে কেউ দাম দিত না। আবার অন্তু, দীপু, সঞ্জয়ন, এরা এদের বাবাদের শ্রদ্ধাই করত। এদের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। এখন সব হিসাবের বাইরে।

আমার কথা ব্রতী আর কি বলত ?

অনেক, অনেক বলত। সব সময়ে নয় মাঝে মাঝে। এই দেখুন না, ব্রতীর বেসে যাওয়ার কথা পনেরই জানুয়ারী। ও ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে উনিশে নিয়ে গেল। শুধু আমি জানতাম জন্মদিনটা, ওর জন্মদিনটা আমার কাছে খুব মূল্যবান। ও সব বিশ্বাস করত না। তবু আপনার জন্যই ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে···আমি জানতাম, কাউকে বলি নি। তবে ওকে খুব বলেছিলাম।

ও কি বলল ?

হাসল। যে কথার জবাব দিতে চাইত না, সে কথার উত্তরে ব্রতী হাসত। বলল, আমি তোর মত স্ট্রং নয় বোধহয়।

আর কী বলত ব্রতী ?

বলত আপনি খুব ভাল। বলত আপনি থরোলি নন-আণ্ডারস্ট্যানডিং কিন্তু আপনাকে ও এক্সপ্লেইন করতে পারে। আপনার ওপর ওর কোন রাগ নেই। ও ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়ে প্রথমটা চাকরি-বাকরির কথা ভাবত। তখন বলত আপনাকে নিয়ে ও চলে যাবে কোথাও। পরে অবশ্য সে সব কথা আর বলে নি।

তাহলে সুজাতার ক্ষুধিত, আঁকড়েধরা ভালবাসাও পরোক্ষে ব্রতীর মৃত্যুর জন্য দায়ী? তাঁর কষ্ট হবে বলে ব্রতী সেদিন কলকাতায় ছিল। নইলে ব্রতী চলে যেত বেসে। বেস কোথায়?

সলিটারি সেলে থাকলে মানুষের মন অনুসন্ধানী ও ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। লাশঘরের ডাক্তারের ছুরির মত।

নন্দিনী বলল, নিজেকেই শুধু দোষ দেবেন না। যেভাবেই হোক, ব্রতী হয় ত বেসেও মরত। যদিও অনিন্দ্য বিট্রে না করলে···

তবু মনে হয়···

অনিন্দ্য বিট্রে করল সেটাই আসল কথা। আমরা কোন দল ভেঙে বেরিয়ে আসি নি। সরাসরি কনভার্ট। অনিন্দ্য দল ভেঙে এসেছিল। এসেছিল বলে কয়ে নির্দেশ মত। সমুরা সেদিন পাড়ায় ফিরবে, আগে কথা হল। পরে ডিসিশান্ চেনজ্ হল। আমরা সময়ে অর্গানাইজেশনের এইসব দুর্বলতার জন্যে সাফার্ করেছি। একেবারে আন্ডারগ্রাউণ্ড অর্গানাইজেশন য়ু অলওয়েজ ডিপেন্ড আপ অন আদার্স। সমুরা যাবে না, এ কথা তাদের অনিন্দ্য জানিয়ে দেবে, তারপর সে যে জানিয়েছে সে খবর ব্রতীকে জানাবে।

ব্রতী সেজন্য বাড়িতে বসেছিল।

হ্যাঁ। কিন্তু অনিন্দ্য সমুদের কিছুই বলে নি। ও পাড়ায় চলে গিয়ে অন্যদের খবর দেয়। দিয়ে আর ও ফেরে নি সোজা কলকাতার বাইরে চলে যায়। আবার সন্ধ্যায় লালটুকে মিট করার কথা। আমি যখন জানি ওরা চলে গেছে, ব্রতীকে সে কথাই

জানাই। তারপর ব্রতী আর ফারদার্ ডিরেকশনের জন্যে অপেক্ষা করে নি। নিজেই ও সমুদ্রের সাবধান করতে চলে যায়।

তুমি···তুমি কি করে জানলে?

আমি জেনেছিলাম ভোরে। পার্থর যে ভাই সেই রাতেই পালায়, সে আমাকে জানায়।

তুমি তখন···

আমি সেই সকালেই অ্যারেস্ট্ হলাম।

সেই সকালেই?

হ্যাঁ! অনিন্দ্য আমাদের ইউনিট্টাকেই বিট্রে করেছিল।

সে তখন কোথায়?

কে, অনিন্দ্য? অনিন্দ্য তখন বাইরে।

বাইরে?

অন্য স্টেটে।

তারপর?

তারপর জেলে ছিলাম। তখন মনে হত···

কি?

অনিন্দ্যকে মারব। এখন আর মনে হয় না।

এখন কি?

না মাসীমা, আমি বদলাই নি। তাই শুধু অনিন্দ্য নয়, অন্যভাবে সবকিছুর বিরুদ্ধে হয়ত আবার লড়তে হবে।

আবার, নন্দিনী?

হোআই নট?

কেন বল? তা হলে তোমাকেও···

আপনি বুঝতে পারছেন না। য়ু লাভ ট্যু ইনটেন্সলি···তারপর জেল-জেরা-চোখের ওপর বাতি—দে ট্রাই টু ব্রেক য়ু—তখন য়ু ফাইন্ড ইওরসেল্ফ। আমি কোনদিন, আপনি যে রকম ভাবছেন, সে রকম সহজ, স্বাভাবিক হতে পারব না। শুধু ব্রতীর জন্য নয়।

থাকলে হয়ত আমরা বিয়ে করতাম। কিংবা করতাম না। কি করতাম তা নির্ভর করছিল অন্যান্য জিনিসের ওপর। জানিনা কি হত। তারপর সব কথা আমি বলব না, য়ু লুজ টেস্ট ফর সো মেনি থিংস।

ব্রতীকে তুমি খুব ভালবাসতে?

তখন তাই মনে হত। এখনো তাই মনে হয়। শুনেছি সময়ে সবই সবাই ভুলে যাব। কিংবা ওর মুখ আবছা হয়ে যাবে মনে। ভাবলে ভয় করে।

হ্যাঁ।

আপনারও?

হ্যাঁ।

জানি না ভুলে যাব কি না। জানি না কম মনে পড়বে কি না। কিন্তু শুধু ব্রতী নয়……যখন ভাবি সো মেনি ডায়েড, ফর হোআট? জানেন জেল থেকে বেরিয়ে সবচেয়ে আগে কি বুকে লেগেছিল?

কি?

যখন দেখলাম সব কিছু নর্মাল, চমৎকার, যেন যা হবার হয়েছে এখন সব শান্ত হয়ে গেছে, এই ভাবখানা চতুর্দিকে। তখন বুক ভেঙে গিয়েছিল।

কিন্তু এখন তো সব শান্ত হয়ে গেছে নন্দিনী?

না!

নন্দিনী চেঁচিয়ে উঠল। সুজাতা আবার বিমূঢ়।

শান্ত হয় নি, হতে পারে না। তখনও কিছুই কোয়ায়েট ছিল না। এখনো নেই। ডোন্ট সে; সব শান্ত হয়ে গেছে। আফটার অল য়ু আর ব্রতীজ মাদার। সব শান্ত হয়ে গেছে এ কথা আপনার বলা বা বিশ্বাস করা উচিত নয়। কোত্থেকে এই কম্প্লাসেন্সি আসে?

কিছুই শান্ত হয় নি ?

না, হয় নি। হোয়াই ডিড দে ডাই ? কি শেষ হয়েছে ? মানুষ সুখে আছে ? রাজনীতি খেলা শেষ হয়েছে ? ইজ ইট এ বেটার ওআর্ল্ড ?

না।

হাজার হাজার ছেলে বিনা বিচারে আটক, তবুও বলবেন সব শান্ত হয়ে গেছে ?

নন্দিনী মাথা নাড়ল, বার বার। বলল সবাই আমাকে তাই বোঝায়। মা বলে তুই ত আর কিছু করবি না। তবে কেন বিয়ে করবি না, সংসার করবি না।

তুমি কি···

মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে। নইলে বেরোতে দিত না। আমি মরতে চাই নি। না বেরোলে আমার ট্রিটমেন্ট হত না। এখনো আমি ইনটার্নড।

কিসের ট্রিটমেন্ট ?

ও, আপনি বোঝেন নি ? আমার চোখের নার্ভ, আলোর নীচে বাহাত্তর ঘণ্টা, আটচল্লিশ ঘণ্টা থেকে থেকে নষ্ট হয়ে গেছে। আমি ডান-চোখে বলতে গেলে দেখতে পাই না। দেখে বোঝা যায় না।

না। আমি ত বুঝি নি।

নষ্ট হয়ে গেছে একটা চোখ।

এখন তুমি কি করবে ?

জানি না। মানে, চোখের চিকিৎসা করব জানি। আর কি করব জানি না। তবে মার কথামত বিয়ে করব না সন্দীপকে।

সন্দীপ কে ?

একটি ছেলে। ভাল চাকুরে। এখন বোধ হয় আমাদের মত মেয়েকে বিয়ে করা ধীমান রায়ের কবিতা লেখার মত আরেকটা ফ্যাশন। নইলে সে আমায় বিয়ে করবে কেন, আমি কারণ খুঁজে পাই না।

কি করবে তুমি নন্দিনী ?

বললাম, যে জানি না। এখনো খুব ডিস্টার্বড্, কনফিউজ্ড্ লাগে কোন কোন বিষয়ে। সব অচেনা অজানা মনে হয়। নিজেকে কোন কিছুর সঙ্গে আইডেন্টিফাই করতে পারি না। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা হ্যাজ মেড মি আনফিট ফর দিস সোকল্ড নর্মালসি। যা আপনাদের কাছে নর্মাল মনে হয়, তাই আমার কাছে আবনর্মাল মনে হয়। কি করব বলুন ?

না, কিছু বলব না।

আমার বন্ধুদের কেউ বলতে গেলে বেঁচে নেই। সে সব কথা. যাদের কথা, আমার সব সময়ে মনে হয় যে সব কথা, তাদের কথা বলি, এমন একজন নেই।

তোমার বাড়িতে ত সবাই আছেন ?

তা আছেন। এটা আমার বাড়ি নয়। এক আত্মীয়ের বাড়ি। বাবা মা কলকাতায় থাকেন না।

তাঁদের সঙ্গে···

তাঁদের কাছেও আমি একটা সমস্যা, বুঝতে পারি। কি জানি কি করব। হয়ত শুনবেন···

কি ?

নন্দিনী হাসল। সুন্দর, উজ্জ্বল হাসি। বলল, হয়ত শুনবেন আবার ধরে নিয়ে গেছে। কি করব বলুন ?

সুজাতা বসে রইলেন। এখন বসে থাকার সময় নেই। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শীতের সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি নামে। এখন তাঁর বাড়ি ফেরা উচিত। কিন্তু পা যেন উঠতে চাইছে না।

আপনি যাবেন না ?

এবার যাব।

আর কিন্তু দেখা হবে না।

তুমি কি কোথাও যাবে ?

না। এখানেই থাকব। কিন্তু আর দেখা করে কি হবে?

সুজাতা মাথা নাড়লেন। কিছুই হবে না। কেননা নন্দিনী আর তাঁর জীবনের রেখা সমান্তরাল। মিলিত হন, এমন একটি বিন্দুও রেখাদুটির মধ্যে নেই।

একটা জিনিস তোমায় দেব?

কি?

এটা তুমিই রাখ।

ব্রতীর ছবি। সর্বদা তাঁর ব্যাগে থাকে, কাছে থাকে।

নন্দিনী ছবিটা নিল। তক্তপোশের ওপর রাখল। তারপর বলল, আমার কাছে আর কিছু নেই। ছিল।

আমার আরো আছে।

এ ছবিটা বোধহয় কলেজে তুলেছিল কেউ।

জানি। অনিন্দ্য।

চলি নন্দিনী। তুমি, তুমি ভাল থেক। কখনো কোন দরকার হলে জানিও।

জানাব।

নন্দিনী হেসেই বলল। কিন্তু সুজাতা জানলেন নন্দিনী জানাবে না। নন্দিনীও জানল সে জানাবে না। দুজনে দুজনের কাছে আবার অপরিচিত হয়ে যাবেন। শুধু সুজাতার জগৎ আর আগেকার মত থাকবে না। ব্রতী কেন সেদিন সন্ধ্যায় নীল শার্ট পরে বেরিয়ে গেল, কেন হাজার চুরাশি হয়ে গেল, আজ সারাদিন তার ব্যাখ্যা টুকরো টুকরো খুঁজে পেয়েছিলেন সুজাতা। বাকী জীবনটা সেই টুকরোগুলো খাপে খাপে মেলাতে মেলাতে কাটবে।

একটু এগিয়ে দিই, বাইরে আলো নেই।

নন্দিনী হাতড়ে হাতড়ে দরজার কাছে গেল। ওর হাঁটা দেখে মনে হল বোধহয় ওর দু'চোখের দৃষ্টিই ক্ষতিগ্রস্ত।

বাইরে আসবে?

না। আমি বাইরে যেতে পারব না। হোম ইনটার্নড। তা ছাড়া কেউ না থাকলে ভরসাও পাই না।

তবে থাক।

সুজাতা ওর কপালে আর মুখে হাত বোলালেন। খুব ইচ্ছে করল ওকে বুকে টেনে নিতে। ওকে দোলা দিতে। ব্রতীকে যেমন করে বুকে টেনে নিতেন তেমনি করে ওকে টেনে নিতে। স্বাভাবিক জীবন্ত ক্ষুধিত ইচ্ছে। সমুর মা যে ইচ্ছের বশে শ্মশানে বলেছিল অরে আমার বুকে আইনা দে। অরে বুকে নিলে আমি অহনই শান্ত অইমু। আর কান্দুম না।

একদিন আমি আর ব্রতী কথা বলতে বলতে আপনাদের বাড়ী অব্দি হেঁটে এসেছিলাম। ব্রতী বলেছিল আপনার কাছে একদিন আমাকে নিয়ে যাবে। সে অনেকদিন আগে।

সুজাতা মাথা নাড়লেন। অনেকদিন নয় নন্দিনী, হয়ত বছর চারেক আগে কিন্তু বছরের হিসাব নয়, অন্য হিসাবে তা অনেকদিন হয়ে গেছে। সেইসব স্বাভাবিক দিনের পর যে দিনের অন্তে একবার ব্রতীর মাকে দেখে আসা যায়, সে সব দিনের পর অজস্র আলোকবর্ষ কেটে গেছে।

সুজাতা আস্তে বললেন চলি।

নন্দিনী কিছুই বলল না। পেছন ফিরল ও, ময়লা ও অন্ধকার দেওয়ালে হাত রাখল। তারপর আস্তে আস্তে চলে যেতে লাগল ভেতরপানে। ওর প্রতিটি পদক্ষেপ ওকে সুজাতার কাজ থেকে কতদূরে নিয়ে যেতে থাকল। সুজাতা বেরিয়ে এলেন। কলকাতার রাস্তা।

সন্ধ্যা

শীতের সন্ধ্যা অনেক আগে নামে, তাই এত অন্ধকার। অন্ধকার আছে বলে সুজাতার বাড়ির ঘরে ঘরে আলো এত উজ্জ্বল। গত কয়েকদিন ধরে ব্যাঙ্কের পর বাড়ি এসে সুজাতা সাবান জলে ন্যাকড়া ডুবিয়ে জানালার কাচ পরিষ্কার করেছেন, তাই আলোর প্রভা এমন করে বাইরে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হয়েছিল। কালও সামান্য বৃষ্টি হয়েছে। তাই কয়েকটা পোকা এত শীতেও বাইরে থেকে কাচে পাখা ঠুকছে, আলোর বৃত্তে ঘুরছে। এমনি হয়, এমনি হয়ে থাকে। শুধু যা যা নর্মাল নন্দিনীর কাছে তা চিরদিন আবনর্মাল হয়ে থাকবে। নন্দিনীর গায়ে একটা চাদর ছিল। ব্রতী শীতের সময় পুরনো, জীর্ণ শালটা গায়ে দিতে ভালবাসত।

দিব্যনাথ বহুক্ষণ ধরে দরজার কাছে আসছেন আর যাচ্ছেন নিশ্চয়। কেননা এখন তিনি মাঝের দু'বছরের নাম, বিবেচক কণ্ঠস্বর ভুলে গিয়ে ঠিক আগেকার দিব্যনাথের গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

এতক্ষণে বাড়ি ফিরতে পারলে? আশ্চর্য!

সুজাতা কথা বললেন না। দিব্যনাথ এবং সেই টাইপিস্ট মেয়েটির সামনে যখন ব্রতী গিয়েছিল, সময়টা মনে মনে হিসেব করলেন। হ্যাঁ, সেই সময় থেকে ব্রতী তার স্কলারশিপের টাকা বাড়িতে দিতে শুরু করে। সুজাতা আজ বুঝছেন, ব্রতী যে তখনি বাড়ি থেকে চলে যায় নি তার কারণ তিনি। ব্রতী তুই আমাকে কোন কথা বলিস নি কেন? আমার উপর তোর ভালবাসা অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল? যেন ছোট মেয়ের ওপর বাবার ভালবাসা?

সুজাতা প্যাসেজ পেরিয়ে আস্তে আস্তে ড্রয়িংরুমে ঢুকলেন। প্রতিটি ফুলদানিতে ফুল। উজ্জ্বল, উজ্জ্বল আলো। গোলাপের রং প্রগাঢ় নিখাত লাল। হায়! লালগোলাপের গুচ্ছে উজ্জ্বল আলোতে,

যারা তাদের বিশ্বাস গচ্ছিত রেখেছিল, তারা তাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে নিয়েছে কবে। তবু গোলাপ কি প্রগাঢ় লাল, আলো কি উজ্জ্বল, বিউটিফুল। নন্দিনী আর ব্রতীর সঙ্গে এরাও বেইমানী করেছে তবে। সুজাতা মাথা নাড়লেন।

বড় টেবিলটা নিচের বারান্দায় বের করা হয়েছে। স্কুলে পড়ার সময়ে কত বর্ষার দিনে টেবিল বের করে ব্রতী টেবিলটেনিস খেলেছে বন্ধুদের সঙ্গে। একবার এই বারান্দায় ব্রতীরা রবীন্দ্রজয়ন্তী করেছিল। বাবলু চিরকাল চালবাজ। সেই বয়সেই বাবলু লিখেছিল, রবীন্দ্রনাথ খুব গরিব ছিলেন বলে ক্লাস এইটেই স্কুল ছেড়ে দিয়ে পদ্য লিখে পয়সা রোজগার করতেন। ব্রতী রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' আবৃত্তি করেছিল। আলোকবর্ষ কেটে গেছে তারপর।

টেবিলের ওপর ধবধবে সাদা চাদর বিছানো। টেবিলের একটা পায়ার ব্রতীর জুতোর ঠোক্করে কাঠের চাকলা উঠে গিয়েছিল। টেবিলের ওপর কাঁটা, চামচ, ন্যাকপিন, ওয়াইন, গ্লাস, জল, কাচের গ্লাস, খাবার দেবার ডিশ, কফি দেবার পেয়ালা, সব সাজানো। এর কোন কিছুতেই ব্রতী নেই, কোথাও নেই। ব্রতীর বাড়ীতে, যে বাড়িতে সে বড় হল, জীবন কাটাল, সে বাড়িতে সে ব্রতীকে খুঁজে পাওয়া এত কঠিন। সুজাতা দেখলেন কালো রঙের ওপর লাল ও সোনালি চেরিফুল আঁকা পেয়ালা। ওগুলো নীপার। তবে নীপাও এসেছে।

খাওয়ার ঘরে ঢুকলেন। টেবিলে সন্দেশের বাক্স, রসগোল্লার হাঁড়ি, দই। ওয়ালডর্ফ আর সাবিরের নাম লেখা খাবারের বাক্স। আজকের জন্যে দোকানে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। সাইডবোর্ডের ওপর সস, ভিনিগার, মাসটার্ড, নুন, গোলমরিচ, সালাড। বিনি কাটগ্লাসের বোলে লঙ্কা কুচিয়ে ভিনিগারে ভিজিয়েছে।

হেম!

হেম ছুটে এল।

এক গেলাস লেবুর শরবত।

হেম চলে গেল। দিব্যনাথ ঢুকলেন।

প্রৌঢ় ভোগী ও মাংসল চেহারা। এই প্রথম সুজাতার মনে হল অত ঘাড় চেঁছে চুলছাঁটা মুখে স্নো মাখা কুৎসিত। মনে হল দিব্যনাথের চিকনের পাঞ্জাবি আর পাড় দেওয়া শাল না পরলেও পারেন। পায়ের জুতো এই দিনের জন্যে কেনা, দিব্যনাথ সবচেয়ে দামী গেঞ্জীও পরেছেন সুজাতা জানেন।

কি ভেবেছ তুমি? জান, অন্তত পঞ্চাশজন লোক আসছে।

জানি।

মানে?

ব্যবস্থা করাই ছিল। নীপা এসেছে। তুমি বাড়িতেই ছিলে। ব্যবস্থা হয়েই গেছে যখন তখন আর কথা বাড়িও না।

কথা বাড়িও না! তুমি ভেবেছ কি?

তুমি—এই মুহূর্তে—এখান থেকে—বেরিয়ে না গেলে—আমি—আবার—বাড়ি থেকে—বেরিয়ে যাব—আর ফিরব না।

সুজাতা থেমে থেমে বললেন। ঘেন্না করছে, ভয়ানক ঘেন্না করছে। দিব্যনাথ আর টাইপিস্ট মেয়ে। দিব্যনাথ আর সুজাতার দূর সম্পর্কের ননদ। দিব্যনাথ আর ওঁর এক জ্ঞাতি বউদি।

দিব্যনাথ যেন গালে চড় খেলেন। চৌত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে সুজাতা একবারও এভাবে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন নি।

তুমি সারাদিন কোথায় ছিলে তা জিগ্যেস করতে পারব না?

না।

হোয়াট!

দু'বছর আগে, বত্রিশ বছর ধরে তুমি কোথায় সন্ধ্যা কাটাতে, কাকে নিয়ে গত দশ বছর ট্যুরে যেতে, কেন তুমি তোমার এক্স-টাইপিস্টের বাড়িভাড়া দিতে তা আমি কোনদিন জিগ্যেস করি নি। তুমি আমায় একটি কথাও জিগ্যেস করবে না। কোনদিন না।

গড !

যখন বয়েস কম ছিল, তখন বুঝতাম না। পরে তোমার মা তোমার প্রত্যেকটি পাপ, হ্যাঁ পা—প ঢেকে চলতেন বলে কোনদিন জিগ্যেস করতে প্রবৃত্তি হয় নি। তারপর আই হ্যাড নো ইন্‌টারেস্‌ট টু নো। তবে তুমি যেভাবে বাড়ি থেকে, তোমার পরিবারের কাছ থেকে, চুরি করে সময় কাটাতে, আমি তা করি না। আরো শুনতে চাও ?

—তুমি আজ···

হ্যাঁ। হোআই নট ? আজ নয় কেন ? যাও।

যাব !

হ্যাঁ। যাও।

'যাও' কথাটা সুজাতা আদেশের মত করে বললেন। দিব্যনাথ বেরিয়ে গেলেন ঘাড় মুছতে মুছতে।

আজকের পর সুজাতা থাকবেন না। আর থাকবেন না। যেখানে ব্রতী নেই সেখানে থাকবেন না। ব্রতী থাকতে যদি একদিনও এমনি করে মনের কথা দিব্যনাথকে বলতে পারতেন ! বলে যেরিয়ে যেতে পারতেন ব্রতীকে নিয়ে ! তাহলেও ফেরাতে পারতেন না কিছুই হয়ত। শুধু ব্রতীর মনের কাছাকাছি আসা যেত। ব্রতী জেনে যেত সুজাতাকে সে যা জেনেছে, তাই সব নয়। জেনে গেল না।

হেম ঢুকল, শরবত দিল। সুজাতা এক ঢোকে খেলেন। বললেন গরম জল দাও হেম। স্নান করব। তুমি জল টেনে ওপরে তুল না, নাথু আছে ত ?

নাথু বরফ আনতে গেছে পাশের বাড়ি।

বাড়িতে বরফ জমল না ?

না, মিস্তিরি এসে বললে কি যেন খারাপ হয়ে গেছে। সারতে ষাট টাকা লাগবে। তাও এখন হবে নি।

তবে জল থাক।

এখন চান কর নি, পরে ক'রবে খন।

পারেই করব।

সারাদিনে কিছু খেইছিলে ?

না। ইচ্ছে হয় নি।

এখন ওপরে যাবে ত ?

হ্যাঁ।

কিছু খাবে ?

না। নীপা কখন এসেছে ?

সকালে। তিনি ত এখেনেই খেল।

মেয়েকে এনেছে ?

না। তার ইস্কুলে কি হতেছে যেন।

ঘরদোর সাজালে কে ?

কেন, বউদিদি।

কাপ, ডিশ, সব বের করল কে ?

স—ব ছোড়দিদি করেছে। তুমি বেইরে যেতে সে অমায় খুব খানিক বকলে। আমি কাজ কত্তে পারি নি, বসে বসে খেতেছি, ছোটখোকার নাম ভাঙিয়ে তোমার কাছ হতে আদায় কত্তেছি সব।

বকল কেন ?

চানের জল ফুটন্ত গরম হয়ে গিছিল। তা বাদে আরো কি বাটতে বলেছিল মুকে মাখবে। আমি বল্লু, আমার মনে নি অত কত্তা।

তারপর ?

তা বাদে ঘরদোর সাফ কত্তে লাগল। বউদিদি বলেছিল, কেন আমি কি নি ? একটা দিন তুমি কারুক্কে তার দে নিশ্চিত হতে জান নি। তা বাদে দুজনে খুব খানিকটা ঝগড়া বিবাদ হল। কি হল তা জানি নি, সব ইংরাজিতে ঝগড়া হচ্ছিল।

তুই শুনতে গিয়েছিলি কেন ?

শোন কত্তা ! আমি কখনো ওদের কথা শুনতে যাই ? দুজনে এমন চেল্লাচেল্লি করলে যে আস্তা হতে মানুষ শুনেছে।

তারপর ?

তা রাত্রে ছোড়দি যেয়ে বুঝি বড়দিকে ফোন কল্লে। তিনি এসে বউদির মান ভাঙাল। তা বাদে বউদি সব সারলে। তা বাদে তিনোজনে খুব গল্প গাছা করলে, খেলে। তখন আর কিছু মুখ-ভার দেখিনি বাবু। তা বাদে তিনোজনে বেইরে যেয়ে কোথা হতে চুল বেঁদে এল। খুব হেসে হেসে ঢুকল।

তুলির বন্ধু চুল বাঁধতে আসে নি ?

না।

আচ্ছা, তুই এবার যা।

হেম চলে গেল। সুজাতা ঘর থেকে বেরোলেন। রেলিং ধরে ধরে ওপরে উঠতে লাগলেন, কষ্ট হচ্ছে, খুব কষ্ট। ব্রতী হবার আগের দিন শরীরে বড় কষ্ট ছিল। আর কারো জন্মের কথা তেমন করে মনে নেই, শুধু ব্রতীর কথা এমন করে মনে আছে কেন ? ব্রতী তাঁর মনে একটা দুঃসহ ব্যথা হয়ে বেঁচে থাকবে বলে ? সিঁড়ির এইখানটাই ব্রতী সেদিন···তলপেটে ব্যথা। ভেবেছিলেন তুলির বিয়ের পর অপারেশন করাবেন। এখন বুঝতে পারছেন আগেই করতে হবে। আজকের দিনটা কেটে গেলে সুজাতা বাঁচেন। কাল ভাববেন কাল কি করবেন।

আজকের তারিখে এনগেজমেণ্টের দিন ফেলতে তাঁর ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তাঁর মত কেউ জিগ্যেস করে নি। টোনি কাপাডিয়ার মা'র গুরু সোয়ামীজী আমেরিকায় থাকেন। সোয়ামীজী এই তারিখটা ঠিক করেছেন। টোনি মা'র কথার ওপর কথা বলে না। মা'র টাকায় সে ব্যবসা করছে।

দিব্যনাথ খুব খুশি হয়েছেন। টোনি তাঁরই মত মাতৃভক্ত। মায়ের প্রতি কথায় টোনি 'হ্যাঁ' বলে। মাতৃভক্ত হওয়াটা এক্ষেত্রে অধিকন্তু। মাতৃভক্ত না হলেও টোনি তাঁর কাছে পাত্র হিসেবে খুবই আকাঙ্ক্ষিত হত। টোনিই দিব্যনাথকে শ-বেন্‌সনের অডিট পাইয়ে দিয়েছে।

টোনির বিষয়ে দিব্যনাথ অত্যন্ত দুর্বল। তাছাড়া তুলি তাঁর প্রিয়তম সন্তান। তুলির চেহারা, স্বভাব দিব্যনাথের মা'র মত।

টাইপিস্ট মেয়েটির কথা তুলিই সবচেয়ে আগে জেনেছিল। জেনেও কথাটি চেপে যায়। ওর মনে দিব্যনাথের প্রতি কোনরকম বিরাগ বা ঘৃণা হয় নি। বরঞ্চ, পরে ভেবে সুজাতার গা ঘিনঘিন করেছে, মেয়েটির ঔদ্ধত্য এতদূর বেড়েছিল, ও বাড়িতেই ফোন করে বলে দিত ওঁকে বলে দেবেন আজ সন্ধ্যায় আমি মার্কেটে যাব। তুলি সে ফোন ধরেছে। তুলি ফোন ধরলে খবর দেওয়া চলবে, অন্য কেউ ফোন ধরলে খবর দিতে হবে না এ কথা নিশ্চয় দিব্যনাথই মেয়েটিকে বলে দেন।

তুলি ওর বাবাকে ঠিক মত খবর পৌঁছে দিত। সেই সময়টা ওর তুলির মধ্যে, বাবার বিষয়ে কি রকম একটা অধিকারবোধ এসে গিয়েছিল। তুলির তত্ত্বাবধানে সে সময়টা দিব্যনাথ ভাল জামাকাপড় পরেছেন। সন্ধ্যার আগে তাঁর রক্ষিতার সঙ্গে সময়টা কাটিয়ে আসবার পর (তুলি জানত ওঁরা সোম-বুধ-শুক্রবার দেখা করেন) তুলিই ছুটে যেত বাবার সুপ চিকেনসালাড নিয়ে ওপরে। খুব একটা তৃপ্তি ও গর্ব অনুভব করত তুলি। যেমন ওর ঠাকুমা করতেন। ওর বাবা যে একজন পুরুষের মত পুরুষ, বিয়ে করতে হলে ওরকম পুরুষ মানুষই দরকার, এসব কথা তুলি সগর্বে বলত। বলত, দাদা একটা কাপুরুষ। বউয়ের আঁচল ধরে ঘোরে।

কথাটা যখন জ্যোতি শ্বশুরকুলের কোন আত্মীয়ের কাছে জেনে আসে, বাড়িতে কথাবার্তা হয়, তখন তুলিই বলেছিল, দাদা! দোষ দেওয়া খুব সোজা। কিন্তু যারা এভাবে এসকেপ্ খোঁজে, তাদের জীবনে নিশ্চয় কোন আনহ্যাপিনেস থাকে। বাবার ত আছেই।

বলেছিল, ঠাকুমা ত বলতেন ঠাকুরদা কোন সন্ধ্যাই বাড়িতে কাটাতেন না। তাতে কি ঠাকুমা মানুষ হিসাবে কম ছিলেন?

ব্রতী কিছুই বলে নি। তুলি থাকলে সে টেবিলে বসে খেত না। তুলি যতক্ষণ বাড়ি থাকত, কথা বলত না। এখন মনে হয় ব্রতী সবই

জেনেছিল। বোধ হয় ভেবেছিল যাঁর সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হবার কথা সেই সুজাতাই যখন নীরব রয়েছেন, তখন সে কোন কথা বলবে না। কিন্তু সুজাতার বিষয়েও তার আনুগত্যবোধে নিশ্চয় ফাটল ধরেছিল, নইলে বাড়ি ছেড়ে যেতে চেয়েছিল কেন? সুজাতা ব্রতীকে কোনদিন বলতে পারবেন না কেন তিনি চুপ করে ছিলেন। ব্রতীর দিকে চেয়ে ব্রতী মানুষ হোক, পড়া শেষ করুক, তারপর ব্রতীকে নিয়ে চলে যাবেন ভেবে সুজাতা সব সহ্য করেছিলেন, ব্রতী তা জেনে গেল না। জানলেও কি সে পথ বদলাত? বদলাত না। বদলাত না জানেন বলেই ব্রতী তাঁর প্রিয়তম সন্তান। ব্রতী ছোটবেলায়ও মা'র মনের একটা দিক যে শূন্য তা বুঝত বলেই মাকে বলত বড় হলে আমি তোমাকে একটা কাচের বাড়িতে রেখে দেব। ম্যাজিক কাচের বাড়ি মা, তুমি সবাইকে দেখতে পাবে, তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না।

সেই জন্য ক্লাস টেনে, 'তোমার প্রিয় মানুষ' রচনা লিখতে আমার মা, বলে রচনা লিখে এসেছিল। সেই ব্রতী! যে কেটে গেলে রক্ত দেখলে ভয় পেত, আবার সহ্য করত ঠোঁট টিপে। ব্রতীর মুখে আঙুল বোলাবেন, আদর করবেন। চোখ বুজে শেষবার আঙুল বুলিয়ে দেখবেন অনুভবে নাকের খাঁজ, ভুরুতে কাটা দাগ, মুখের রেখা, এমন অক্ষত একটি জায়গাও ব্রতীর মুখে ছিল না। শুধু ত হত্যা উদ্দেশ্য নয় হত্যাকে বিলম্বিত করা, পৈশাচিক উল্লাসে মৃত্যুমান মানুষের ছটফটানি দেখা, সবই হত্যার প্যাটার্নের অমোঘ অঙ্গ।

হত্যা করা যায়, শাস্তি হবে না, কেননা ঘাতকরা অত্যন্ত চতুর, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর পরিণতি আর কোন্ সমাজে হতে পারে? যারা তরুণদের হত্যার মন্ত্র দিয়েছিল তাদের কেন কেউ চিনিয়ে দেয় না? তাদের গায়ে কেন কাঁটার আঁচড় লাগল না? এমন দুর্বোধ্য কেন সবকিছু? আজ কি তারা সক্রিয়, অসম্ভব সক্রিয়? নন্দিনী বলেছে কিছুই কোয়ায়েট নয়। সুজাতা ত শুনেছেন, ওরা সহস্র প্রলোভন দেখায়, নখের নিচে ছুঁচ, চোখে হাজার বাতির আলো, জঘন্যভাবে দেহের

গোপন জায়গায় নির্যাতন, কত-শত অত্যাচার করে তাতেও ব্রতীর মত ছেলেরা নতি স্বীকার করে না, আজও করে না। তখন জে. সি. থেকে পি. সি.। জেল থেকে ফের পুলিশের হেফাজত। তারপর ফাইল বন্ধ। দাঁড়ি। অজয় দত্তের মা বলেছিলেন, এবার হাবুল দত্তের ফাইলটাও বন্ধ করে দিতে পারেন। হাবুল ওরই অ্যালায়াস।—সঞ্জীবনের দিদিকে ওরা বলেছেন, মাকে ছবি দেখাবেন? একমাস বাদে আসুন। বাহাত্তরটা ছবি উঠবে রিলে। আপনার ভাই ত সবে তিরিশ নম্বর। মাস খানেক রিলটা ফুরোক, তখন ছাপা হবে।

রেলিং ধরে ধরে উঠলেন সুজাতা। এই রেলিং চড়ে ছোটবেলা পিছনে নামত ব্রতী। হেম দুধের গেলাস হাতে সিঁড়ি ভেঙে উঠত, ব্রতী পিছনে নামত। হেম ওপরে উঠত, ব্রতী আবার ছুটে উঠত, আবার নামত। বড় হয়ে ওই রেলিঙে হাত রেখে কতবার নেমেছে ব্রতী, কিন্তু এ বাড়ির কোথাও ব্রতী নেই, ব্রতী আজও আছে, অন্যান্য জায়গায়, ফুটপাতের লাল গোলাপ-ফেস্টুনে, পথের আলোয়, মানুষের হাসিতে, সমুর মা'র মুখে, নন্দিনীর চোখের নিচের চিরস্থায়ী ছায়ায়—সুজাতা ব্রতীকে কোথায় খুঁজে ফিরবেন? তাঁর শরীর যে আর বয় না। ব্রতী কোথায় কোথায় ছড়িয়ে আছে বলে সুজাতা কি তাকে খুঁজে—তাকে খুঁজে খুঁজে—

তুলির ঘরে ঢুকলেন।

তুলি আর নীপা একরকম গাঢ় নীল বেনারসী পরেছে, একরকম স্টোল। আজকের বিশেষ দিনে দুই মেয়ে ও বিনিকে এই শাড়ি ও স্টোল দিব্যনাথের বিশেষ উপহার। তিনটে শাড়ি, তিনটে স্টোল নশো টাকার ওপর। নশো টাকায় সমুর মা'র মত মানুষের বহু অভাব দূর হয়ে যায়।

তুলি আর নীপা তাঁর দিকে তাকাল। আয়নায় তিনজনের ছায়া। সুজাতা দেখলেন তাঁর শাড়িতে ভাঁজ, চেহারা অবসন্ন, কাঁচা পাকা চুল বিস্রস্ত।

তুলি ও নীপা সুসজ্জিত, সুন্দর। দুজনের মুখের ভাবই তৃপ্ত হতে পারত, কিন্তু ওদের মুখের অতৃপ্তি ও অসন্তোষ প্রসাধনে ঢাকা পড়ে নি।

তুলি, তোর গয়না।

সুজাতা ব্যাগ খুলে গয়না বিছানায় ঢাললেন। কয়েকটা তুলে আবার ব্যাগে রাখলেন।

ওগুলো সরিয়ে নিচ্ছ কেন?

নীপা আর বিনিকে যা যা দিয়েছি, তোকেও তাই দিলাম।

দেখলে দিদি? আমি বলি নি?

নীপা একই সঙ্গে মিহি-আদুরে-উদার-ক্ষমাভরা গলায় বলল, ওগুলোও তুমি তুলিকে দাও মা। আমি কোন ক্লেমই করব না সত্যি।

তোর ক্লেমের কথা আসছে কোথা থেকে?

বিনিকেও ত দিয়েছ।

ব্রতী থাকলে ব্রতীর বউকে দিতাম। একটা সুমনকে, একটা তোর মেয়েকে দেব।

অন্যগুলো?

যা হয় করব।

তুলি ক্রুদ্ধ হিসহিস, চাপা আক্রোশের গলায় বলল, আশ্চর্য! তুমি জান আমি অ্যান্টিক জুয়েলারি কি রকম ভালবাসি! টোনি এগুলো মডেল করে কস্ট্যুম জুয়েলারি বানাবে, বাইরে পাঠাবে, সবই তুমি জানতে।

তুই বলেছিলি, আমি শুনেছিলাম! এখন আমি মত বদলেছি।

কিন্তু, কেন?

এমনি। তোর ঠাকুমার দেওয়া বাবার দেওয়া সব গয়নাই দিয়ে দিলাম। এগুলো আমার বাবার দেওয়া, আমার কাছে থাক।

চমৎকার বিবেচনা।

এগুলো অন্যদের দেব ঠিক করেছি।

এগুলো না দিলেও পার।

না নিতে ইচ্ছে হয় ফেলে দে। আজ তোর সঙ্গে বেশি কথা বলব না তুলি, চেঁচাস না. সকালে যথেষ্ট চেঁচিয়েছিস।

কে বলেছে, হেম ?

হ্যাঁ। তুমি এবাড়িতে যে কদিন আছ, হেমকে একটি কথাও বলবে না। হেমকে আমি আমার খরচে রেখেছি, তোমার বাবা রাখেন নি। হেম ব্রতীকে মানুষ করেছিল। ও যে কদিন থাকবে, তোমার ইচ্ছে হলে ভাল ব্যবহার করবে, কিন্তু খারাপ ব্যবহার করতে পারবে না। আজকের দিনে, ব্রতীর জন্মদিনে ও সকাল থেকে কাঁদছে জেনেও তুমি যে ব্যবহার করেছ তার ক্ষমা নেই।

আজকের দিনে! আজকের দিন সম্পর্কে ত তোমার ভারি সেণ্টিমেণ্ট তাই সারাদিন বাইরে কাটিয়ে এলে।

তারিখটা তোমরা আমার মতে ঠিক করনি, টোনির মা'র কথায় করেছ। আমি যে ফিরেছি সেটাই যথেষ্ট মনে ক'র।

নীপা বলল, আমার কথাও ত ভাবতে পারতে মা ? আমি ত রোজ রোজ ডে স্পেনড্ করতে আসি না।

সুজাতা হাসলেন। বললেন, তুই সারা বছরে ক'দিন আমার কথা ভাবিস ? এই রাস্তা ধরে গাড়ি চালিয়ে সর্বত্র যাস। অমিত ট্যুরেই থাকে, তুই ঘুরেই বেড়াস। জ্যোতির টাইফয়েড হল, সুমনের জন্মদিন গেল, তুই একবারও আসতে পারিস নি। তোকেও দোষ দিই না আমি, এই রকমই হয়। তবে তুই আসবি বলে আমি বসে থাকব আশা করতে পারিস কি ?

তুমি—

আর কথা নয় তুলি। আমি তৈরি হতে যাচ্ছি।

নিজের ঘরে গেলেন সুজাতা। আলমারি খুললেন। শরীরের প্রত্যেকটি শিরা ও স্নায়ু বলছে না-না-না। কিন্তু আজকের সন্ধ্যার কর্তব্যটুকু করতেই হবে। সলিটারি সেল। সুজাতা প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে যা করে করুক, তিনি অবিচল থাকবেন স্ব-কর্তব্যে।

নিজেকে নিজেই কারাদণ্ড দিয়েছেন। এখন কি কারাগার ভেঙে বেরনো যায়? সাদার ওপর সাদা বুটিতোলা কাল-পাড় ঢাকাই শাড়ি, সাদা জামা বের করলেন।

আলমারি বন্ধ করলেন। বাথরুমে ঢুকলেন।

দরজা বন্ধ করে শাওয়ার খুলে মেঝেতে বসে পড়লেন সুজাতা। যত শীত হক, ব্যথার জন্যে শীত করছে না। ঠাণ্ডা জলে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। বরফের মত ঠাণ্ডা জল। বরফ। আইস স্ল্যাব। বরফের স্ল্যাবে সদ্যোমৃত রক্তাক্ত শরীর ফেলে রাখলে রক্ত বন্ধ হয়। ঠাণ্ডা জল। শীতল। ব্রতীর আঙুলের মত, ব্রতীর কপালের, বুকের, হাতের মত ঠাণ্ডা কোন শীতলতা হতে পারে না। আজ সারাদিন ব্রতীর সঙ্গে ছিলেন। ব্রতীর আঙুল কি ঠাণ্ডা, হিম শীতল চোখের পাতা, নিমীলিত, ঘন কালো পল্লব চোখের, তামাটে হয়ে যাওয়া ফর্সা রং, চুল ঠাণ্ডা বরফজলে ভেজা, ঠাণ্ডা শীতল, শীতল, হিম, হিম, আজ সারাদিন ব্রতীর সঙ্গে ছিলেন। শ্মশানে রাত্তির। পুলিশ পাহারায় ব্রতী। শ্মশানে ফ্লাটলাইট। দেওয়ালে লেখা। নামের পর নাম। নাম-নাম-নাম-নাম অ্যালুমিনিয়ামের দরজা খড়াস করে নামল—ব্রতী। বিদ্যুৎবহ্নিতে ভেতরে ব্রতীকে সেঁকা হচ্ছে! সারাদিন ব্রতীর সঙ্গে ছিলেন। ছাই নেন, অস্থি নেন, মাটি দিয়া ধরেন. গঙ্গায় ফালাইতে হইবে। ব্রতীর সঙ্গে ছিলেন সারাদিন।

শাওয়ার বন্ধ করলেন। পরের পর সব করে যেতে লাগলেন। স্নায়ু-শিরা-হৃৎপিণ্ড-রক্ত বলছে না-না-না। সুজাতা গা মুছলেন, মাথা মুছলেন। কাপড় ছাড়লেন। গায়ে পাউডার মাখলেন। কাপড় জামা, সব পরলেন। ভিজে চুলই বাঁধতে লাগলেন হাত ফিরিয়ে।

ব্রতী বলত, সবসময়ে কেমন করে কর্তব্য কর মা?

সবসময়ে কর্তব্য করতে হবে এইভাবেই সুজাতাকে তৈরি করা হয়েছিল।

এইভাবেই সুজাতা তৈরি হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি নিজেকেও

তৈরি করে চলতেন। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সব, স—ব, বাজে খরচা, নিজের অপচয়। কাকে তিনি সাহায্য করতে পেরেছেন? দিবানাথ, নীপা, তুলি কাউকে নয়।

দরজা খুললেন। ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। চোখের নিচে কালি। থাকুক। নন্দিনীর চোখের নিচে, অন্ধপ্রায় চোখের নিচে কি প্রগাঢ় কালিমা, পাহাড়ের নিচের চিরছায়ার মত ছায়া ঢালা।

নন্দিনীর কাছে আর যাবেন না সুজাতা, আর যাবেন না সমুর মা'র কাছে। ব্রতীকে তিনি কোথায় খুঁজে বেড়াবেন? না কি একদিন তিনিও আর খুঁজবেন না?

সব মিটে যাবার পর দিব্যনাথ ছেলেমেয়ের কাছে হোহো করে কেঁদেছিলেন। বলেছিলেন, তোমাদের মা'র চোখে জল নেই! আন্‌ন্যাচারাল ওম্যান্‌।

তাঁর চোখে জল নেই।

একদিন কি আসবে, যেদিন সুজাতা যে কোন জায়গায়, যে কোন লোকের কাছে বসে কাঁদবেন, বলবেন ব্রতীর নাম?

ভাবতেই ভয় করল। শিউরে উঠল বুক। ব্রতী কি সেদিনই মরবে? এখনো কি তাঁর দুঃসহ শোকের বন্দীত্বে ব্রতী বেঁচে নেই? এখনো যে সব কোয়ায়েট নয়, জেলের পাঁচিল উঁচু, নতুন নতুন ওয়াচ টাওয়ার। বন্দীদের জন্য বড় ফাটক অব্দি খোলা হয় না। মাঝরাতে ভ্যান আসে। রেডিও সিগনাল দেয়। ওপর থেকে ক্রেন নামে। জন্তুর মত বন্দীকে যন্ত্রের নখে আঁকড়ে ক্রেন উঠে যায়, জেলের ভেতর নামিয়ে দেয়। অষ্টমী পুজোয় উন্মত্ত কলকাতা। গুলি-কালগাড়িগুলি পালাবার চেষ্টা—গুলি হাবলু দত্তের ফাইল বন্ধ করে দিতে পারেন—গুলি-ফাইল বন্ধ—একটি পাহারাঘেরাও শবযাত্রা—পেছনে ক্রুদ্ধ-ভীষণ সংকল্পে কঠিন মুখে শবযাত্রীরা হাঁটছে—তরুণ, তরুণ মুখ। ব্রতীর কথা তেমন করে সুজাতা বলে বলে সহজ হবেন, শোককে করে নেবেন আটপৌরে?

সাদা শাল নিলেন। চটি পরলেন। জল খেলেন। দরজায় টোকা। বিনি মুখ বাড়াল।

ঠিক তুলি ও নীপার মত চুলবাঁধা, একরকম শাড়ি, একরকম স্টোল। এখন এরা সকলের মত হতে চায়। শুধু নিজের মত হতে চায় না। এর নামই ফ্যাশন।

মা, হয়েছে?

হ্যাঁ। সুমন কি করছে?

আয়ার কাছে। এখন ঘুমোবে।

চল, নিচে চল।

সুজাতা আলো নেভালেন। বেরিয়ে এলেন। ভেতর থেকে স্নায়ু-শিরা-হৃৎপিণ্ড বলছে না-না-না, কিন্তু সুজাতা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। যা ভাল লাগে না, তাও করে চলার নাম কর্তব্য করা। নিজে খুব কর্তব্য করেন বলে মনের কোথাও কি খুব অহংকার ছিল? ব্রতী বলেছিল, নীপার মেয়ের জন্মদিনে যাওয়ার ব্যাপারে সুজাতে বলেছিল, চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়া বেশি দরকার।

নীপা দুঃখিত হবে।

দুঃখিত হবে না মা।

সুজাতা কিছুই বলেন নি।

দিদি দুঃখিত হবে এটা কনভেনশনের কথা। দিদির দুঃখ অথবা সুখ যে তোমার বা আমাদের কোন ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে না তা ত তুমি জানই মা। তবে কেন চোখ দেখাতে যাবে না?

ব্রতী জানত, সব জানত। জানত বলে সকলকে ও অত সহজে বরবাদ করে দিতে পেরেছিল। শেষ অব্দি ও বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরেও এসেছিল। সুজাতাকে বলেছিল, চল চোখের ডাক্তারের কাছে।

তুই যাবি?

হ্যাঁ, চল না।

চোখে আট্রোপিন দিয়ে সুজাতা একা একা যাবেন, কষ্ট হবে,

সেইজন্যেই ব্রতী ওঁকে নিয়ে গিয়েছিল ডাক্তারের কাছে। তারপর সুজাতাকে নীপার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়েছিল।

ভেতরে যাবি না?

ব্রতী হেসেছিল। কথা বলে নি। সেদিন ও ধুতি আর শার্ট পরেছিল। প্যাণ্ট পরেই চলাফেরা করত, কিন্তু ধুতি পরতে ব্রতী খুব ভালবাসত। শুধু সুজাতার চোখের ব্যাপারে নয়, যখন ব্রতী একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল তখন কোন কোন কথা ওর একারই মনে থাকত। ব্রতী মারা যাবার পর, সেই যে সকালে সুজাতা কাঁটাপুকুরে যান, ফিরতে তাঁর অনেক দেরি হয়েছিল।

তিনি ভেবেছিলেন স্বভাবতই ব্রতীর দেহ তাঁর হাতে দেবে পুলিস। কিন্তু তা দেবে না, কোন সময়েই দেবে না শুনে তিনি একবার অবাকও হন নি। অবাক হবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ফিরে এসেছিলেন। তারপর খবর পেয়ে আবার চলে গিয়েছিলেন। দিব্যনাথের ঘোরাঘুরি, কাকুতিমিনতির ফলে পোস্টমর্টেম সকলেরই আগে তাড়াতাড়ি হয়েছিল। লাশ-ঘরে ডাক্তার তখন ফর্মালিনে মুছে নগ্ন শরীর বিদ্যুৎগতিতে চেরাই-ফাঁড়াই করে দিত। না দিলে চলত না। তখন কত যে ভ্যান কাঁটাপুকুরের দিকে আসত দিনেরাতে!

বিকেল থেকে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকলেন সুজাতা, বাড়ি ফিরলেন রাত-দুপুরে। যখন ফিরলেন, তখন নিস্তব্ধ, বিমূঢ় কিভাবে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যাবে সেই সমস্যায় চিন্তাকুল বাড়িতে হঠাৎ সমুর মা'র মত স্বাভাবিক শোকে হেম কেঁদে ফেটে পড়েছিল মাথা ঠুকে, সাত দিনেরটি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে, তোমার বাঁচার কথা ছিল না গো মা, আজ তারে কোতা একে এলে? বলেছিল, কে আমার শত কাজে বিস্মরণ না হয়ে বাতের ওষুধটুকু এনে দেবে, কে বলবে আস্তায় দেকে এশন নে হেঁটে যেতে আচে? রেকশো করে যেতে জান নি? কে রেকশো ডেকে তুলে দেবে গো!

কে সুজাতাকে সেই রাতে সবকিছু শেষ হয়ে যাবার পর বাড়ি

ফিরতে কোলে মাথা নিয়ে বসেছিল। হেম, শুধু হেম। ব্রতী হেমকে সবসময়ে কত যে দেখত। অথচ দিব্যনাথ বলতেন আনফীলিং সান্। সুজাতার বলতে ইচ্ছে হল, আজ আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারছি না ব্রতী। ব্রতীকে বলতে ইচ্ছে হল, তুই যে বলতিস সবচেয়ে কঠিন নিজের মত হওয়া। আমি আজ নিজের মত করে যদি চলতে পারতাম ব্রতী।

কিন্তু সবসময়ে যদি নিজের ইচ্ছেমত চলতে পারতেন তাহলে ত ব্রতী আসতই না পৃথিবীতে। ফর্সা, নরম, রেশম চুল, জন্মচুল ও পইতেতেও ফেলেনি। মূল্য ধরে দেওয়া হয়েছিল শুধু। সুজাতার হাত চেপে না ধরে কোনদিন রাস্তা পেরোয়নি ছোটবেলা, সেই ব্রতী!

সুজাতা মাথা নাড়লেন। সামনে ড্রয়িংরুম। লোকজনের কথা-হাসি-হররা। পৃথিবীটা কি শুধু মৃতদেহের জন্য তৈরি? যে মৃতরা খায়, ঝগড়া করে, লোভে ও লালসায় উন্মত্ত হয়?

যারা শ্রদ্ধেয় হয় না, যাকে ব্রতী ভালবাসতে পারে।

ব্রতী শ্রদ্ধা করতে চায়, ভালবাসা পেতে চায়।

এখনো চায় কেননা এখনো কিছুই কোয়ায়েট নয়। অশান্ত, অস্থির, ক্ষুব্ধ, যন্ত্রণার্ত, বিদ্রোহী, অসহিষ্ণু সময়।

সুজাতা পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

মিসেস কাপাডিয়া ওঁর গুরুর কথা বলছিলেন। একটু দূরে নীপা হাতে স্কচ নিয়ে এর পেছনে তার পেছনে মুখ লুকোচ্ছে। খিলখিল করে হাসছে। ওর পিসতুতো দেওর বলাই দত্ত কাঁটায় একটা মাংসের টুকরা নিয়ে ওকে তাড়া করছে। নীপার মুখে ও মাংসটা গুঁজে দেবেই দেবে।

টোনির বোন নার্গিস গেরুয়া নাইলন উলের অত্যন্ত আঁট জামা ও প্যান্ট পরে একটু একটু করে নাচছে আর ঘাড় ঘুরিয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে। নার্গিস গুরুর ভক্তসেবিকা। ও ভারতবর্ষে সোয়ামীর

ধর্ম প্রচার করবে। নার্গিসের এক হাতে লেমন কার্ডিয়াল। অত্যধিক মদ্যপানের জন্য ত নার্সিংহোমেই থাকে ডিপ্সোম্যানিয়ার রুগী হিসেবে। শুধু বিশেষ বিশেষ দিনে বেরিয়ে আসে। তবে গেরুয়া পরতে ভোলে না।

বিনিকে দেখা যাচ্ছে না। তুলি, নীপার বর অমিত, টোনি, টোনির বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চেঁচিয়ে হেসে উঠল। তারপর গাল পেতে দাঁড়াল। টোনি ওর গালে চুমো খেল। কে ছবি তুলল ওদের!

মিসেস কাপাডিয়ার হাতে টল স্কচ্। সুজাতা ও অন্যরা ওঁর কথা শুনছেন। সুজাতার মুখে স্মিত হাসি। মাথা কাজ করছে না। শরীর অবসন্ন।

যেকোন সোয়ামীকে দেখলাম মাইডিয়ার, তুমি বিশোয়াস করবে না, সামথিং ইন মি, কট্ ফায়ার জোলে উঠল। তকুনি আমি দেখতে পেলাম সোয়ামীর মাতার পেচনে হেলো। ঠিক যেন আলো জোলচে। আলোটা গ্রু বাইটা অ্যানড ব্রাইটা, যেন এ থাউজেন্ড সান্স।

ফেল্টমোড়া ঘরে কুশকে ওরা স্ট্রাপ করে ফেলে রেখেছিল। মুখের ওপর মাথার দিক থেকে দুটো হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলছিল। আর জ্বলছিল। কুশের দশটা আঙুল থেকে নখ তুলে নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। শরীরের প্রত্যেকটা স্নায়ুকেন্দ্রে সুঁচ বেঁধানো হচ্ছিল আর তুলে নেওয়া হচ্ছিল। আটচল্লিশ ঘণ্টা, তারপর বাহাত্তর ঘণ্টা, তারপর বলা হয়েছিল য়ু আর ফ্রি। বের করে বাড়িতে আনা হয়েছিল। তারপর বাড়ির সামনে নামিয়ে কুশকে গুলি করা হয়। ওর চোখের মণি গলে গিয়েছিল।

কিন্তু মিসেস কাপাডিয়া হাজার সূর্যের জ্যোতি দেখেও দৃষ্টি হারান নি। অন্তর্দৃষ্টি তাঁর খুলে গিয়েছিল।

দি সোয়ামী ওঅজ ফ্লাইং হিজ ওন প্লেইন। হি জাস্ট লুকড অ্যাট মী, আর বললেন, এস আমার কাছে এস। মীট মী অ্যাট মায়ামি। আচ্চা আমি যে মায়ামি যাব, তা কেমন করে জানলে বল ডিয়ার। বললেন ইউ আর দি গার্ল ইন দি বুক ইউ আর ক্যারিয়িং। কি বই

তা জান ডিয়ার? ব্ল্যাক গার্ল ইন্ সার্চ অফ গড। আমি ব্ল্যাক ছিলাম ডিয়ার। আমার সোল ব্ল্যাক ছিল। আই ফাউন্ড মাই গড। অ্যান্ড অল ওঅজ লাইট। ইন বোথ সেন্স। আলো আর হাল্কা।

নন্দিনীর ভেতর কি যেন একটা মরে গেছে। মরে গেলে মানুষ ভারী হয়ে যায়। ব্রতীর হাতটা কি ভারী ছিল। অনুভূতি মরে গেলেও বোধহয় শবদেহের মত গুরুভার হয়ে যায়। সেই মৃত অনুভূতির ভার টানছে বলেই কি নন্দিনী পা টেনে টেনে চলে? আর স্বাভাবিক হবে না ও, স্ত্রী হবে না, জননী হবে না। যারা পথের আলো থেকে, মানুষ থেকে প্রতিটি ধুলোকে ভালবেসেছিল, তারা কোনদিন জননী হবে না। যারা সন্তানের সঙ্গ সহ্য করতে পারে না, পুরুষ থেকে পুরুষ, মদ থেকে হাশিশ, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, তারা স্নেহহীন, ভালবাসাহীন জীবনে শিশুদের আনবে, শুধু অপচয়।

সেই থেকে সোয়ামী আমার গুরু। নট ওনলি মাইন। সারা দুনিয়ার মানুষ একদিন সোয়ামীর ডিসাইপল হবে। লাইক বিবেকানন্দ, আমেরিকা হ্যাজ ডিস্কভারড হিম। নাউ ইনডিয়া উইল নো হিম।

যিশু মিত্র হাঁ করে মিসেস কাপাডিয়ার কথা শুনছিলেন। তিনি সুজাতাকে বললেন, আলাপ করিয়ে দিন আমায় জাস্ট ডু। আই অ্যাম ডাইং টু নো হার। প্লীজ ডু।

মিসেস কাপাডিয়া, যিশু মিত্র! আমাদের বন্ধু।

সো প্লীজড!

মলি মিত্র ফিসফিসিয়ে সুজাতাকে বললেন, ভেবেছে তুমি ইংরেজী জান না, তাই বাংলা বলছে। হাউ ফানি! কি পরে এসেছে দেখেছ? ইন্সাফরেবল বিচ। হীরে দেখাচ্ছে! আমাকে!

মিসেস কাপাডিয়া 'হীরে' কথাটা শুনলেন। হাসিমাখা উজ্জ্বল চোখে মলির দিকে তাকালেন। বললেন, ডায়মন্ডস পরতেই হবে। সোয়ামী বলেন হীরে হচ্ছে সোলের সিমবল। পিওরিটি।

হাউ নাইস!

কিন্তু তোমায় আমি মাপ করিনি ডিয়ার।

হোয়াই ?

ডগ শোতে তুমি আমার গোলডেন রিটিভারকে প্রাইজ নিতে দাও নি।

আমি নয় রোভার।

ইয়েস। আমি এত রেগে গেলাম। কিন্তু হোয়েন আই স ইওর ডগ।

সুজাতার দিকে ফিরে বললেন, তুমি বিশোয়াস করবে না ডিয়ার, সামথিং ইন মি ওয়েন্ট ম্যাড উইথ এনভি।

যিশু মিত্র বললেন, সোয়ামীর কথা বলুন।

তিনি গড। তিনি অলমাইটি। হি ওয়ান্টস ইনডিয়া টু হ্যাভ দিস পভারটি। তাই লোকের এত সাফারিং। হোয়েন হি উইল্‌স, সবাই রিচ হবে।

সত্যি ?

নিশ্চয়! যখন টোনি আর তুলির বিয়ের কথা জানালাম, হি ওয়েন্ট ইন টু ধেয়ান। ধেয়ান করে বললেন মেয়েটি ভেরি ভেরি আনহ্যাপি। ওদের বাড়িতে একটা ইভিল ছায়া পড়েছে।

বললেন ?

নিশ্চয়! বললেন, টোনি আর তুলি যখন স্টেট্‌সে যাবে, তখন উনি কয়েকটা ফুল দেবেন। সেগুলো বাড়ির চারিদিকে পুঁতে দিতে হবে।

মলি মিত্র হঠাৎ সুজাতাকে বললেন, তুমি কি করে কনভার্ট হবে সুজাতা ? তোমার গুরু আছেন না ?

কনভার্ট ?

কেন, মিঃ চ্যাটার্জি যে বললেন হোল ফ্যামিলি সোয়ামীর বিলিভে কনভার্ট হবে।

জানি না ত।

গুরু থাকতে কি গুরু বদলানো যায় ?

আমার কোন গুরু নেই মলি

আহা, রণু আর ব্রতী একবার গেছলো না ? যখন ওরা স্কুলে ছিল ? পরীক্ষার ফল জানতে ?

উনি শাশুড়ির পুরুত ছিলেন। শাশুড়ী ওঁকে দিয়ে ঠিকুজি করাতেন।

লক্ষ্মীশ্বর মিশ্র। ব্রতীর ঠিকুজিও করেছিলেন। ব্রতীর ঠিকুজি কি বার বার দেখেন নি সুজাতা ? দীর্ঘায়ু-অবধ্য-ব্যাধিভয়হীন আঘাত শঙ্কাহীন ? সুজাতা ঠিকুজিটা ছিঁড়ে ফেলে দেন।

মলি মিত্র মিসেস কাপাডিয়াকে বলেন, য়ু নো, হার ইয়ংগার সান ব্রতী···

সুজাতা বললেন, মিসেস কাপাডিয়া, আমি একটু ওদিকে যাই।

তিনটি টল হুইসকির পর মিসেস কাপাডিয়ার মন অত্যন্ত টলটলে। চোখে রুমাল দিলেন উনি।

আই নো ! ও ডিয়ার ! হাউ ইউ মাস্ট বি সাফারিং ! সোয়ামী কি বলেছেন শোন ডিয়ার।

নিশ্চয়।

সুজাতা উঠে গেলেন।

যিশু মিত্র বললেন, আজই ত তার ডেথ অ্যানিভার্সারি।

সত্যি ?

মলি মিত্র বললেন, দ্যাট বয় ব্রতী। আই নেভার ট্রাস্টেড হিম। সেদিন যখন বাড়ি থেকে বেরোয় কি বলেছিল জানেন ? বলেছিল রণুর কাছে থাকবে রাতে। অথচ ফাস্ট ইয়ারের পর থেকে রণুর সঙ্গে ওর কন্টাক্টই ছিল না। রণুর কাছে থাকব। অ্যাজ ইফ হি কুড বি রণুজ ফ্রেন্ড। পরদিন ত কাগজে কিছু বেরোয় নি, মানে ব্রতীর নাম—যিশু ওয়েন্ট টু ক্লাব। হোঅট প্লেসিং আওয়ার এরিয়া ওঅজ ফ্লি ! ক্লাবে যাওয়া যেত, নইলে কি বাঁচা যেত ? আমি ত কাগজ খুলতাম না। বাড়িতে কাউকে কাগজ পড়তে দিতাম না। কি

হরিফাইং সব খবর। তা যিশু ক্লাব থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বলল, জান, চ্যাটার্জির ছেলে মারা গেছে।

ওঃ। হাউ অ্যানন্যাভিং ফর ইউ!

তারপর আমার দাদা, হ্যাঁ ডি. সি.—ফোন করলেন ব্রতী এখানে এসেছিল কিনা? শুনেই যিশু রণুকে প্যাক অফ করল বম্বে।

ইউ ডিড রাইট।

ন্যাচারেলি আমরা এলাম কনডোলেন্স জানাতে। তখন চ্যাটার্জি হ্যাড এ ব্যাড টাইম। হাশ আপ করার জন্যে বেচারার কি ছুটোছুটি, তখন আমাদের যা কষ্ট হত। জানেন, নিশ্চয় সুঙ্গাতা ইজ এ থরোলি আনফীলিং ওয়াইফ। শী স্পয়েল্ট হার সন। নইলে এ রকম ফ্যামিলির ছেলে কখনো···?

যিশু মিত্র বললেন, ওর কি দিন যে গিয়েছে তখন! আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

স্টেট্সে।

টোনি?

এখানেই। আজ মলি সেইড, পার্কস্ট্রীট ক্যামাক স্ট্রীট, ফিউ এরিয়াজ ওয়্যার ফ্রি। টোনির বন্ধু সরোজ পালই ত তখন অপারেশন ইন-চার্জ। ব্রিলিয়াণ্ট বয়। কি কারেজ! যে ভাবে ধরত এদের!

সত্যি!

মলি মিত্র বললেন, কি ফুলিশনেস! সমাজের জুয়েলগুলোকে তোরা মারলি। লাভ হল কি? তোরাও মরলি। মাঝখান থেকে অনেস্ট ট্রেডারগুলো ভয় খেয়ে এখান থেকে ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে ভেগে গেল।

টেলিং মি? স্টেট্স থেকে আই ফ্লু টু বম্বে। বম্বে থেকে কেউ আমাকে কলকাতা আসতে দেবে না। কলকাতায় না কি বড়লোক দেখলেই মেরে ফেলছে তখন। আমি কি করলাম জানেন?

কি করলেন?

মিসেস কাপাডিয়ার মুখ গৌরবে জ্বলজ্বল করে উঠল। তিনি বললেন, সুচিত্রা শাড়ি পরে সেকেন্ড ক্লাসে চড়ে কলকাতা চলে এলাম। বললাম, মাই হাজব্যান্ড অ্যান্ড মাই সান নীড্ মি। সোয়ামীর রেসিং আছে, নো সোর্স ইন্দি ওঅর্ল্ড ক্যান কিল মি!

যিশু মিত্র এই কাহিনীর উপসংহারে বললেন, সুজাতাকে লাভলি দেখাচ্ছে কিন্তু। সাদা। গ্রিফ। অপূর্ব।

মলি মিত্র বললেন, দ্যাটস এ স্টান্ট। সুজাতা জানেন ইভনিঙে সবাই রং পরবে। অ্যাজ এ কনট্রাস্ট, সাদা পরেছেন।

মিসেস কাপাডিয়া বললেন, কি মেকাপ ইউজ করেছে বলত ডিয়ার? সামথিং আনইউজুয়াল।

মেকাপ? সুজাতা? ডিয়ার কাপাডিয়া, শী নেভার ডাজ।

বাট, হোআই? শী ইজ বিউটিফুল।

টোনি বলল, লেট্ মি ইন্ট্রোডুস মাই বিউটিফুল মাদার-ইন-ল। মা, এ জার্নালিস্ট। আপনাকে দেখার জন্যে মরে যাচ্ছে।

টোনি বাংলাতেই বলল। কলকাতার ছেলে। বাংলা ভালই জানে।

জার্নালিস্ট বলল, চমৎকার পার্টি। বিউটিফুল শাড়ি আপনার মেয়ের। মিঃ চ্যাটার্জি সংস্কৃত বললেন, কি চমৎকার! টিপিকাল বাঙালী বাড়ি আপনাদের।

খেয়েছেন?

প্রচুর। আচ্ছা, আমি আপনার ইন্টারভিউ নিতে পারি?

আমার?

আমি বম্বের একটা ওম্যান্স ম্যাগাজিনে লিখি। আপনি মা, স্ত্রী, আবার ব্যাঙ্কের অফিসার। হোম অ্যান্ড কেরিয়ার যে একসঙ্গে করা যায়…

আমি অফিসার নই।

বাট টোনি সেইড…

ক্লার্ক হয়ে ঢুকেছিলাম। কুড়ি বছরে সেক্‌শন-ইন-চার্জ হয়েছি। হাউ নাইস!

কাজেই…

আচ্ছা আপনার ছেলে ত কিল্‌ড ফ্রম দি অ্যাংগল অফ এ সরোয়িং মাদার…

না। মাপ করবেন।

সুজাতা তখনি সরে গেলেন। মেয়েদের ম্যাগাজিনে সুজাতার ছবি। এ বিরীভ্‌ড মাদার স্পীক্‌স। এরা কিছুতেই ব্রতীকে তাঁর কাছে থাকতে দেবে না। অথচ আজ সারাদিন ব্রতীর সঙ্গে ছিলেন। সী…মাই সান ওঅজ…বম্বে সমাজের টপ মহিলারা, রেসের ঘোড়ার মালিক, শিল্পপতির বউ, চিত্রতারকা, সবাই সুজাতা ও ব্রতীর কথা পড়ছে।

সুজাতা অমিতের কাছে গেলেন।

অমিত, খেয়েছ?

হ্যাঁ, মা।

তোমার বন্ধুরা খেলেন কিনা…

সবাই খেয়েছে।

হুইসকি আছে, তবু তাঁর জামাই মাতাল হয় নি দেখে সুজাতা অবাক হলেন। অমিতকে বেছে এনেছিলেন দিব্যনাথ। নীপা, নীপার সেতারের মাস্টারের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। ওকে ধরে এনে এক মাসের মধ্যে বিয়ে দিয়েছিলেন দিব্যনাথ। অনেক খরচ করেছিলেন। দুর্বলচিত্ত, ভিতু, বড় চাকুরে, বড়লোকের আদুরে ছেলে অমিত। নীপার বর।

অমিতের জন্যে সুতাজার দুঃখ হয়। আগে ও মদ খেত না। এখন মাতাল হবার জন্যেই মদ খায়।

ওর বাড়িতে ওর পিসতুত ভায়ের সঙ্গে নীপা বলতে গেলে বসবাস করতে শুরু করার পর থেকে অমিত মদ খাচ্ছে।

সুজাতা বুঝে পান না অমিত কেন ওর পিসতুত ভাইকে কিছু

বলে না। এরকম পরিস্থিতি হলে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে নেয় মানুষ। যদি আবহাওয়াটা হাতের বাইরে চলে গিয়ে না থাকে তবে চেষ্টা করে কথা বলে কয়ে নেয় পিসতুত ভাইয়ের সঙ্গে।

বের করে দেয় পিসতুতো ভাইকে।

চলে যেতে বলে স্ত্রীকে। আইন আছে, আদালত আছে, ব্যবস্থা করে।

অমিত কিছুই করে না, মদ খায়। দিব্যনাথ এসব মেনে চলেন বলে জামাইষষ্ঠীতে দুজনে আসে এ বাড়িতে। অমিতের গুরুদেবের কাছে বছরে একবার দুজনে যায়। অমিত শোয় তেতলায়। দোতলায় একটা ঘরে ওদের মেয়ে এবং মেয়ের আয়া ঘুমোয়। দোতলাতেই বলাই আর নীপার পাশাপাশি শোবার ঘর।

সব যেন কীটদষ্ট, ব্যাধিদুষ্ট, পচাধরা, গলিত ক্যানসার। মৃত সম্পর্কের জের টেনে মৃত মানুষেরা বেঁচে থাকার ভান করছে। সুজাতার মনে হল অমিত, নীপা, বলাই, এদের গায়ের কাছে গেলেও বোধহয় শবগন্ধ পাওয়া যাবে। এরা ভ্রূণ থেকেই দুষ্ট, দূষিত, ব্যাধিগ্রস্ত। যে সমাজকে ব্রতীরা নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল সেই সমাজ বহুজনের ক্ষুধিত অন্ন কেড়ে নিয়ে এদের সযত্নে রাজভোগে লালন করে, বড় করে। সে সমাজ জীবনের অধিকার মৃতদের, জীবিতদের নয়। কিন্তু বলাই কি বলছে?

এখন বাপধনদের অবস্থা কি? সব ত পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। আরে বাবা, বরানগর-বরানগর বলে কেঁদে কেঁদে ধীমান কবিতা লেখেনি? কেঁদে কি হবে? সোজা কথা বরানগরে মোর দ্যান এ হানড্রেডকে কুচিয়ে কাটল বলে না বরানগর এখন শান্ত হয়েছে? যদ্দিন কাটে নি তদ্দিন কি টেনশানই ছিল!

ধীমান কে? ধীমান রায়? যার কথা নন্দিনী বলল? সুজাতা দেখলেন একটি অত্যন্ত ফর্সা মেয়ে শালের ম্যাক্সি পরে হাতে গেলাস নিয়ে বলাইয়ের কাঁধে হাত রাখল। বলল,

অপূর্ব লিখছে না এরা ?

বলাই বলল, বিশ হাজার ছেলে জেলে বলে কাঁদুনি গাইছে ধীমান। ওসব কি বুঝি না ভাবছ ? যখন অ্যাকশন—কাউণ্টার অ্যাকশান চলছিল তখন সব হুমকি খেয়ে বাংলাদেশ-বাংলাদেশ বলে কাগজে কাঁদছিল। এখন সব কণ্ট্রোলে, নাউ হি ফিল্‌স হি ইজ সেফ এনাফ টু রাইট।

যাঃ! কি যে লিখছে! সেদিন একটা কবিতা পড়ে আমার ত কান্না পাচ্ছিল। এই যে, আপনার কবিতার কথা বলছি। হোয়েন ডু ইউ রাইট ? এত বিজি থাকেন! রিয়েলি, ইউ আর ট্রুলি কমিটেড টু দি কজ!

ধীমান রায় উত্তর উল্লিশ, ভোঁতা চেহারা, অতি কুদর্শন। পাকা অভিনেতার মত মুখে নিমেষে সংকোচের ভাব-ফোটালেন। খসখসে, মোটা গলায় বললেন, আর কিছু নিয়ে কি কবি লিখতে পারে ?

রিয়ালি—যখন কবিতাটা পড়লাম! অনুপ দত্ত, উই নো হিম, অনুপ বলল, হি ফিল্‌স।

জানবেন, আজ সবাই ওদের কথাই ভাবছে।

ধীমান রায় অত্যন্ত নিপুণতায় মাখনের টুকরো কামড়ালেন, হুইসকিতে চুমুক দিলেন। সুজাতা শুনেছেন যথেষ্ট মাখন খেলে হুইসকিতে নেশা হয় না। ধীমান রায়কে দেখে বুঝলেন, মাতাল হওয়া ওর উদ্দেশ্য নয়।

জানি, হঠাৎ নীপা বলল। অত্যন্ত হুইসকি খেয়েছে নীপা। ওর চোখে মুখে ঔদ্ধত্য।

জান না কি ? অমিত ব্যঙ্গ করল।

শিওর। একটা ওয়াশড আউট কবি, পরের মুখে ঝাল খায়, তার কবিতায় আবার একস্‌পেরিপেনস্‌ কি থাকবে ? আমার ভাই মরেছিল। তখন তোমাদের সিম্‌প্যাথেটিক কবি কি করেছিলেন ? হাইডিং বিহাইন্‌ড হুজ স্কার্টস ? বলাই বলে নি আমায় ?

ব্রতীকে নিয়ে ত তুমি ফাঁপরে পড়েছিলে তখন। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল তোমার।

কে বলল ?

আমি বলছি।

তুমিই ত আমায় পইপই করে সাবধান করতে।

নট মি।

মিথ্যুক।

টেক দ্যাট ব্যাক!

আই ওন্‌ট।

আমি খিদিরপুরের গাঙুলী বাড়ির ছেলে। তোমার মত একটা তিন পয়সার বেশ্যার কাছে···

অমিত!

সুজাতা নিচু গলায় ধমক দিলেন।

কয়েকটি অস্বস্তিকর মুহূর্তে বিস্ফোরক। সলতে পুড়ছে—পুড়ছে—পুড়ছে। বারুদের স্তূপ ছোঁয়-ছোঁয়-এই ছোঁবে। সলতেটা বারুদ ছুঁল না। কেননা নীপা হঠাৎ এক ঝাঁক পাখির মত কল-কলিয়ে হাসল।

মা! তুমি যে কি! আমরা এ রকম ঝগড়া দারুণ এনজয় করি। নিজেদের সংসারে ক'র।

সুজাতা সরে গেলেন। পার্টি জমেছে। টেম্পো উঠেছে। প্রায় সকলেই মাতাল। টোনির বোন নার্গিস দুটো অ্যাসট্রে বাজিয়ে সোয়ামী! সোয়ামী! বলে নাচছে। যিশু মিত্র উবু হয়ে বসে হাততালি দিচ্ছেন, একটু দুলছেন।

অমিত তিতিবিরক্তি হয়ে বলল, তোমার মা মাইরি একটা সুপয়েল জয়।

ও এখন স্থির করল, মাতাল হবে। নির্জলা হুইসকি গেলাসে ঢালল। গলায় উপুড় করল।

বলাই বলল, নীপা চল কাটি।

চল !

লেট্‌স গো টু শরৎ'স। আজ ফিল্‌ম সেশন। ওর বাড়িতে প্যারিস থেকে আনা সব ছবি—

বলাই ঠোঁটে ও গালে জিভ ঘুরিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করল। শব্দটা যেমন নগ্ন, তেমন মাংসল। শব্দটা শুনেই বোঝা গেল ছবিটা কি রকম হবে। নিশ্চয় উত্তেজক।

চল।

ওরা বেরিয়ে গেল।

ধীমান রায় অমিতকে বললেন, আপনি তো আচ্ছা লোক ?

কেন ?

বলাইয়ের সঙ্গে আপনার বউ যে ফিল্‌ম দেখতে গেল।

তাতে আপনার কি ?

বলাই ! ব্যাটা ক্যালেন্‌ডার পেলেও···

আরে বাবা ! আপনি মদের গন্ধে গন্ধে বড়লোকদের কালটিভেট করেন, তাই এসেছেন। ফ্রি মদ পাচ্ছেন, খেয়ে যান। অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ?

বলাইয়ের সঙ্গে !

অমিত খিকখিক করে চালাক শেয়ালের মত হাসল। বলল, বলাইকে চেনাবেন না, ও আমার পিসতুত ভাই।

ভাই ?

হ্যাঁ মশাই। মহিমারঞ্জন গাঙুলীর পৌত্র আমি, দৌহিত্র ও।

তাই বলুন।

ফেট মানেন। নিয়তি ?

নিশ্চয় মানি না। ঈশ্বর মানি না, নিয়তি মানি না।

ক্যাপ !

কি বললেন ?

রাবিশ। আপনার মত নাস্তিক দুবেলা আমার অফিসে আসে।

আপনি মাতাল হয়েছেন।

আপনি হন নি? ফেট মানুন মশাই. ফেট আছে।

কি রকম?

ফেট ছাড়া কি? বলাই ফ্যামিলির একটা মেয়েকে ছেড়েছে যে, আমার বউকে ছেড়ে দেবে? আরে মশাই, আমার ছোট পিসি, ওর ছোটমাসি, তাকে দিয়ে ওর বদমাশি শুরু হয়। নীপাকে ও সহজে ছাড়বে? তবে হ্যাঁ বলাই বনেদি মাল। ফ্যামিলি ছেড়ে বাইরে বদমাশি করে না।

বলাইয়ের সঙ্গে বউকে···

বলাই আমার ভাই, আবার বন্ধুও বটে। ওর কি কানেকশান জানেন? ওকে চটালে···

মশাই, আপনি দারুণ লিবারাল।

ট্রুলি লিবারাল!

মিঃ কাপাডিয়া বললেন, আমি হচ্ছি সত্যি লিবারাল।

দিব্যনাথ বললেন, জানি।

মিঃ কাপাডিয়া নিভাঁজ সুটের কালো বোতামে আঙুল রেখে বললেন, আমার পলিসি যদি ফলো করে, তাহলে দেশের সব সমস্যা মিটে যায়।

হাউ?

মিঃ কাপাডিয়া নিখুঁত বাংলায় বলতে লাগলেন, দেশের সমস্যা কি বলুন? ইনটিগ্রেশন হচ্ছে না। বহু ধর্ম, জাতি, ভাষা হবার দরুন দেশটা ভেঙে যাচ্ছে। ফুড কোন সমস্যাই নয়। ফুডরায়ট হচ্ছে কি? চাষীরা অত্যন্ত ওয়েল অফ। সবাই রেডিও কিনছে। এমপ্লয়মেণ্ট? প্রচুর লোক চাকরি পাচ্ছে। ন্যাশনাল ওয়েলথ? সকলের হাতে পয়সা আছে। নইলে হাউ কাম, বাড়ি হচ্ছে, গাড়ি কিনছে সবাই, সবাই দামী মাছ মাংস খাচ্ছে?

ট্রু।

ভাষা আবার একটা সমস্যা নাকি? যে সেখানে আছে, সেখানকার ভাষা শেখে। আমি এখানে মদ বিক্রি করছি, বাংলা শিখেছি।

মাস্টার করেছেন।

করতেই হবে। টেগোরের ভাষা।

সত্যি।

ভাষার সমস্যা এইভাবে সল্‌ভ করলাম। তারপর ধর্ম? ধর্মের দরকার কি? বার্ন ডাউন মন্দির মসজিদ, এভরিথিং ফলো সোয়ামী। সোয়ামী জ্যান্ত ঈশ্বর। তাঁকে ফলো কর।

যা বলেছেন।

আমরা, সোয়ামীর চিল্‌ড্রেন ইন ইন্‌ডিয়া, দিল্লী-বম্বে-কলকাতা-মাদ্রাজে আপিস খুলছি। ছ হাজার লোককে চাকরি দেব। প্লেন আর হেলিকপ্‌টার কিনছি। ভারতের সব ভাষায় সোয়ামীর মেসেজ ছাপব। আকাশ থেকে ভারতের সব জায়গায় মেসেজ ছড়াব। ইন নো টাইম, সবাই সোয়ামীকে ফলো করবে।

ট্রু।

ধর্মের সমস্যাও গেল। জাতের সমস্যা? ল করে দাও, কেউ নিজের রাজ্যের জাতের, ভাষার লোককে বিয়ে করতে পারবে না। বাঙালী ম্যারিজ পাঞ্জাবি, ওড়িয়া ম্যারিজ বিহারী, অসমীয়া ম্যারিজ মারাঠী, ব্যস। সব সমস্যা মিটে গেল

টোনির সঙ্গে তুলি যেমন···

আমি গ্রেটফুল ভর দিস্।

সে কি মশাই? আমি গ্রেটফুল। প্রাউড।

আমিও।

গ্রেট মোঙ্গল অফ দি ওয়াইনট্রেড তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক।

আপনিই বা কম কিসে?

টোনি ইজ এ গ্রেট বয়।

তুলি ইজ এ গ্রেট গার্ল।

জ্যাকি ইজ এ গ্রেট সান।
জ্যোতিও ভাই।
মার্গিজ ইজ এ গ্রেট গার্ল।
নীপা টু।
আপনাদের গ্রেট ফ্যামিলি।
আপনাদেরও।
আপনাদের পেডিগ্রি…
আপনারা জমিদার।
আমরা কুলীন।
কুলীন? দ্যাট ইজ গ্রেট।
একদিন ফ্যামিলি ট্রি দেখাব।
নিশ্চয়।
দেখাবেন তখন…
একটা কথা চ্যাটার্জি—
কি?
মিসেস চ্যাটার্জি আপনার ছোট ছেলের শকটা—
না না। শী ইজ অলরাইট।
আপনার ছেলে হয়ে এ রকম…
মিসগাইডেড।
নিশ্চয়ই তাই হবে।
ব্যাড কম্পানি। ব্যাড ফ্রেন্ডস।
মাস্ট বি দ্যাট।
জানেন আমরা বাপ ছেলে কি রকম ক্লোজ ছিলাম?
শুনেছি তুলির মুখে।
বেবিদের মত। হ্যাড নো সিক্রেট ফ্রম ইচ আদার।
তাই ত হওয়া উচিত।
আমাকে ও গডের মত রেসপেক্ট করত।

করবে না ; সাচ এ ফাঁদার !

সেই ছেলে যখন···

ওঃ !

আমার হার্ট ভেঙে গিয়েছিল।

যাবেই ত।

আমি যে কি রকম শক পাই···

দুঃখ করবেন না। সোয়ামী বলেন, ডেথ বলে কিছু নেই। শরীরটা আপনারও মরে যাবে। হেভেনে আপনাদের সোলের দেখা হবে। তখন দেখবেন ছেলে আপনার সেইরকম আছে।

দেখব ? সোয়ামী বলেছেন ?

নিশ্চয়।

সোয়ামীকে আমরা ফলো করবই।

করবেন।

এই যে আমার স্ত্রী। ওগো উনি কি সুন্দর সব কথা বলছেন শোন। শোন না। এদিকে এস।

শুনেছি। আমি পেছনেই বসেছিলাম।

মিসেস চ্যাটার্জি, হুইসকি ?

ধন্যবাদ। আমি খাই না।

শরীর খারাপ লাগছে ?

না।

সুজাতা উঠে গেলেন। বিনি ডাকছে। ব্যথা আসছে, ঘন ঘন আসছে। ব্যথার তরঙ্গ। ঢেউ যেন জোরে জোরে ভাঙছে। সব যেন দুলছে, আবছা হচ্ছে, আবার স্পষ্ট হচ্ছে। জ্যোতি বোধহয় রেকর্ড লাগিয়েছে ; উন্মত্ত আজ।

কেন বিনি ?

মা, তুলি ডাকছে।

কেন ?

টোনির কোন স্পেশাল বন্ধু এসেছেন।

কই ?

বাইরে।

বাইরে কেন ?

গাড়ি থেকে নামবেন না।

নামতে বল।

মা, তোমার পা টলে গেল নাকি ?

ব্যথা করছে।

তুমি বস।

না।

আমি ওঁকে ডাকছি ভেতরে।

না, আমিই যাই।

তুমি কেন যাবে ? আমি যাই।

তুলি অশান্তি করবে।

তবে চল।

আমি ওঁকে নামতে বলি। তুমি খাবারের বাক্স নিয়ে সঙ্গে চল। নামলে ত ভালই। নইলে বাক্সটা দিয়ে দেব।

সেই ভাল।

ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে, ব্যথা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, শীত কমে যায়, গরম লাগে।

সুজাতা শালটা রাখলেন। বাইরে বেরোলেন।

ঠাণ্ডা। শীত। উত্তুরে হাওয়া। অন্ধকার বাগান। অন্ধকার। এই অন্ধকারে যদি হারিয়ে যেতে পারেন ? ফিরে ও ঘরে ঢুকতেন না হয়। রাস্তায় গেটের সামনে কালো গাড়ি।

কালো গাড়ি। কালো ভ্যান। জানলায় জাল, পেছনের দরজায় জাল। জানলার জাল দিয়ে হেমলেট ঢাকা মাথা। সামনে কে ? ড্রাইভারের পাশে ? গাড়িটা গর্জাচ্ছে, স্টার্ট বন্ধ করে নি।

সাদা নিখুঁত পোশাক। পেতলের ব্যাজ।। ডি. সি. ডি. ডি. সরোজ পাল। বাংলা মায়ের দুরন্ত ছেলে সিংহহৃদয় সরোজ পাল। 'সরোজ পাল তোমার ক্ষমা নেই' লেখা অ্যালুমিনিয়ামের দরজায়। ঝপ করে পড়ল। ভেতরে ব্রতী। শারিত নিথর হিমশীতল। সরোজ পাল।

—ইয়েস, আমার মা আছেন।

—না, আপনার ছেলে দীঘা যায় নি।

—নো, এগুলো বাড়িতে থাকবে না।

—না, ছবি পাবেন না।

—ছেলেকে আপনি শিক্ষা দিতে পারেন নি।

—আপনার ছেলে গুণ্ডাদের দলে ভিড়েছিল।

—আপনার ছেলে যা করেছিল, তার ক্ষমা হয় না।

—আপনার উচিত ছিল ছেলের মন জেনে, তাকে আমাদের হাতে সারেনডার করতে বলা।

—না, বডি পাবেন না।

—না, বডি পাবেন না।

—না, বডি পাবেন না।

সুজাতা তাকালেন। সরোজ পাল তাকাল। হাজার চুরাশির মা, ব্রতী চ্যাটার্জির মা। এঁকে দেখতে হবে বলেই ত আসতে চায় নি।

বিনি এগিয়ে এল।

নামবেন না?

না।

একবারও না?

না কাজ আছে। টোনি আর তুলিকে উইশ জানাবেন।

খাবারের বাক্স নিন অন্তত।

দিন। তাড়া আছে। আচ্ছা নমস্কার।

স্টার্ট। গাড়ি গর্জাল। বেরিয়ে গেল।

এখনো কাজ ? এখনো ইউনিফর্ম ? কালো গাড়ি, জামার নিচে ইস্পাতের চেনের জামা, খাপে পিস্তল, পেছনের সিটে হেলমেট পরা সান্ত্রী ?

কোথায় আনকোয়ায়েট, কোথায় কাজ ? ভবানীপুর-বালিগঞ্জ-গড়িয়াহাট, গড়িয়া-বেহালা, বারাসত-বরানগর-বাগবাজার, কোথায় কাজ ?

কোথায় দোকানে ঝাঁপ পড়বে, বাড়িতে বাড়িতে দরজা বন্ধ হবে, রাস্তা থেকে ত্রস্তে পালাবে পথচারী-সাইকেল নেড়ী-কুকুর-রিকশা ?

কোথায় বাজবে সাইরেন ? দুপ দুপ দুপ—রাস্তায় বুটের শব্দ —ভ্যানের গর্জন খট খট খটাখট গুলির আওয়াজ হবে কোথায় ?

কোথায় পালাবে, আবার পালাবে ব্রতী ? ব্রতী কোথায় পালাবে ? কোথায় ঘাতক নেই, গুলি নেই, ভ্যান নেই, জেল নেই ?

এই মহানগরী—গাঙ্গেয় বঙ্গে—উত্তরবঙ্গে জঙ্গল ও পাহাড়—বরফ ঢাকা অঞ্চল—রাঢ়ের কাঁকর-খোয়াই-বাঁধ—সুন্দরবনের নোনাগাং—বন—শস্যক্ষেত্র—কলকারখানা—কয়লাখনি—চা-বাগান কোথায় পালাবে ব্রতী ? কোথায় হারিয়ে যাবে আবার ? পালাস না ব্রতী। আমার বুকে আয়, ফিরে আয় ব্রতী, আর পালাস না।

তাকে যে সারাদিন খুঁজে পেয়েছিলেন সুজাতা, সে যে এই সব কিছুতে আছে, ছিল। আবার যদি ভ্যান চলে, আবার যদি সাইরেনের হুকুমিতে আকাশ চিরে যায়, ব্রতী যে আবার হারিয়ে যাবে। ঘরে ফের ব্রতী, ঘরে ফিরে আয়। তুই আর পালাস না। মার বুকে ফিরে আয় ব্রতী। এমন করে পালিয়ে যাস না। তোকে কেউ পালাতে দেবে নারে, যেখানে যাবি সেখান থেকে আবার টেনে বের করবে। আমার কাছে আয় ব্রতী।

মা! তুমি পড়ে যাচ্ছ।

বিনির হাত ঠেলে দিলেন সুজাতা। ছুটে ফিরে এলেন। ঘরের দরজায় দাঁড়ালেন।

দুলছে, সব দুলছে ঘুরছে-নড়ছে। শবদেহগুলো কে যেন নাচাচ্ছে। শবদেহ, শটিত শবদেহ সব। ধীমান—অমিত—দিব্যনাথ—মিঃ কাপাডিয়া—তুলি-টোনি-যিশুমিত্র-মলিমিত্র-মিসেস কাপাডিয়া—

এই শবদেহগুলো শটিত অস্তিত্ব নিয়ে পৃথিবীর সব কবিতার সব চিত্রকল্প—লালগোলাপ—সবুজ ঘাস—নিয়ন আলো—মায়ের হাসি—শিশুর কান্না—সব চিরকাল, অনন্তকাল ভোগ করে যাবে বলেই কি ব্রতী মরেছিল। এই জন্য? পৃথিবীটা এদের হাতে তুলে দেবে বলে?

কখনো না।

ব্রতী……

সুজাতার দীর্ঘ আর্ত হৃৎপিণ্ডচেরা বিলাপ বিস্ফোরণের মত, প্রশ্নের মত, ফেটে পড়ল, ছড়িয়ে গেল কলকাতার প্রতি বাড়ি—শহরের ভিতের নিচে ঢুকে গেল, আকাশপানে উঠে গেল। হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল রাজ্যের কোণ থেকে কোণে, দিক থেকে দিকে, ইতিহাসের সাক্ষী যত স্তূপের অন্ধকার ঘরে ও থামে, ইতিহাস ছাড়িয়ে পুরাণের বিশ্বাসের ভিতে সে কান্না শুনে বিস্মৃত অতীত, স্মরণের অতীত, গতকালের অতীত, বর্তমান, আগামীকাল, সব যেন কেঁপে উঠল, টেলে গেল। প্রত্যেকটা সুখী অস্তিত্বের সুখ ছিঁড়ে গেল।

এ কান্নায় রক্তের গন্ধ, প্রতিবাদ, সুখী শোক।

তারপর সব অন্ধকার। সুজাতার শরীরটা আছড়ে পড়ল। দিব্যনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন, তবে অ্যাপেনডিক্স ফেটে গেছে।